

উচ্চমাধ্যমিক জীববিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়-৪: অণুজীব

প্রশ্ন ১ নির্দিষ্ট পরজীবীর সংক্রমণে মানুষের রক্ত স্বচ্ছতা এবং কাঁপনিসহ জ্বর আসে। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াও বিভিন্নভাবে পরজীবীর ক্ষতি থেকে মানুষ রক্ষা পেতে পারে।

(ঢা. বো. ২০১৭)

- ক. ইকোলজিক্যাল পিরামিড কী? ১
- খ. পামেলা দশা বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত রক্ত স্বচ্ছতার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্ভীপকের পরজীবী থেকে পরিত্রাণের উপায় বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. খাদ্যজালকের বিন্যাস সমন্বিত পিরামিড আকৃতির ছকই হলো ইকোলজিক্যাল পিরামিড।

খ. পরিবেশে পানি শুকিয়ে গেলে *Ulothrix*-এর প্রোটোপ্লাস্ট বিভক্ত হয়ে কলোনি সৃষ্টি করে এবং মিউসিলেজ নিঃসৃত আবরণীতে অপত্য কোষগুলো আবৃত থাকে। এ অবস্থাকে বলা হয় পামেলা দশা। পামেলা দশা শৈবালকে শুষ্কতা থেকে রক্ষা করে। অনুকূল পরিবেশে কলোনি থেকে জুম্পার উৎপন্নের মাধ্যমে নতুন শৈবাল সূত্র তৈরি হয়।

গ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত লক্ষণসমূহ যেমন রক্তস্বচ্ছতা এবং কাঁপনিসহ জ্বর এর কারণ ম্যালেরিয়া পরজীবী (*Plasmodium vivax*).

রোগজীবাণুবাহী এনোফিলিস জাতীয় স্ত্রী মশকী যখন কোন সুস্থ মানুষকে দংশন করে তখন মশকীর লালার সাথে রোগ জীবাণুর স্পোরোজোয়েট মানবদেহে প্রবেশ করে। হেপাটিক সাইজোগনির পর ম্যালেরিয়ার জীবাণু রক্তের লোহিত কণিকা আক্রমণ করে ও সেখানে অযৌন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে যাকে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি বলে। লোহিত কণিকার অভ্যন্তরে মেটাক্রিস্টোমেরোজোয়েট হিমোগ্লোবিনকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে লোহিত রক্ত কণিকা ভেঙে মেরোজোয়েট বেরিয়ে আসে এবং পুনরায় নতুন লোহিত কণিকা আক্রমণ করে। এভাবে লোহিত রক্ত কণিকার ভাঙানের ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত স্বচ্ছতা দেখা দেয়।

ঘ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত ম্যালেরিয়া পরজীবী *Plasmodium vivax* থেকে পরিত্রাণের উপায় নিয়ে বিশ্লেষণ করা হলো—

ম্যালেরিয়া জ্বরের জীবাণু স্ত্রী *Anopheles* মশকী বহন করে। এ মশকীর দংশনের ফলেই ম্যালেরিয়া জ্বর হয়ে থাকে। তাই ম্যালেরিয়া জ্বর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মশকীর প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস করতে হবে।

যেসব জলাশয়ে মশকী ডিম পাড়ে সেখানে পানির ওপর কেরোসিন বা পেট্রোল জাতীয় তেল ছিটিয়ে দিলে পানির উপর একটি পাতলা স্তর সৃষ্টি হয়। ফলে এ স্তর ভেদ করে মশকীর লার্ভাগুলোর পক্ষে বাতাস গ্রহণ সম্ভবপর না হওয়ায় তারা মারা পড়ে। বি এইচ সি, ডায়েলড্রিন ইত্যাদি কীটনাশক ওষুধ তেলের সাথে মিশিয়ে পানিতে ছিটিয়ে দিলে মশকীর লার্ভা ও পিউপা মারা যায়। জলাশয়ে কই, খলসে, তেলাপিয়া জাতীয় লার্ভা খাদক মাছ চাষের মাধ্যমে মশকীর লার্ভা ও পিউপা ধ্বংস করা যায়। জুডেনাইল হরমোন পানিতে মিশিয়ে দিলে লার্ভাকে আজীবন লার্ভা করে রেখে দেওয়া যায়। দংশন উদ্যত মশকী হাত বা মসকুইটো র‍্যাকেট দিয়ে মেরে ফেলা। বিভিন্ন ফাঁদের সাহায্যে মশকী ধরা। বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান যেমন- সালফার ডাইঅক্সাইডের ধোঁয়া মশা তাড়াতে বা মেরে ফেলতে পারে। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ও বিকিরণ দিয়ে বন্যাত্ত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে মশার বংশ বিস্তার রোধ করা যায়। শয়নকক্ষে মশারী ব্যবহার করা। দেহের অনাবৃত অংশে বিশেষ ক্রিম বা লোশন লাগানো। মশকী নিধন কয়েল জ্বালানো বা স্প্রে ব্যবহার করা। ঘরের দরজা জানালায় নেট লাগানো। মশার উৎপাত বেশি এরূপ জায়গা থেকে শয়ন রক্ষা দূরে রাখা।

উপর্যুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মশার আক্রমণ তথা ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টিকারী *Plasmodium vivax* পরজীবীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ২ মনি ও মুত্তা দুই বোন, চটগ্রাম থেকে বাড়ী ফেরার কয়েকদিন পর তারা দু'জনই জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। তবে তাদের জ্বরের প্রকৃতি এক নয়। মনির কাঁপনিসহ জ্বর আসলেও মুত্তার হঠাৎ করেই প্রচণ্ড জ্বর এসেছিল। রক্ত পরীক্ষায় দেখা যায় যে, মনি রক্তস্বচ্ছতা আর মুত্তার রক্তে অনুচক্রিকার সংখ্যা অনেক কম গেছে।

(ঢা. বো. ২০১৫)

- ক. আদিকোষ কী? ১
- খ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে কী বোঝ? ২
- গ. মনি ও মুত্তার জ্বরের লক্ষণের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো। ৩
- ঘ. মনি ও মুত্তার জ্বর নিয়ন্ত্রণে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে কোষে কোনো সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না সেই কোষই আদিকোষ।

খ. কোনো জীবকোষ থেকে একটি নির্দিষ্ট জিন বহনকারী DNA খণ্ডাণু পৃথক করে ভিন্ন একটি জীবকোষের DNA-এর সঙ্গে জোড়া দিয়ে তাতে কৃত্রিম বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটানোর কৌশলকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে DNA অণুর কৃত্রিম অংশ মানুষ থেকে ব্যাকটেরিয়ায়, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে, প্রাণী থেকে উদ্ভিদে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে তৈরি জীবকে GMO বা GEO বা ট্রান্সজেনিক জীব বলা হয়।

গ. উদ্ভীপকে বর্ণিত মনি ও মুত্তার জ্বরের বিশেষ লক্ষণ থেকে বোঝা যায় যে, মনি ম্যালেরিয়া জ্বরে এবং মুত্তা ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। নিচে মনি ও মুত্তার জ্বরের লক্ষণের মধ্যে অর্থাৎ ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো—

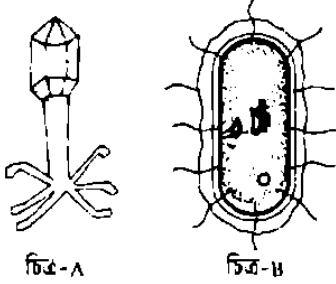
ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রথম দিকে মাথা ধরা, বমি বমি ডাব, অনিদ্রা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। অন্যদিকে ডেঙ্গু জ্বরের ক্ষেত্রে প্রথমদিকে শীত শীত অনুভূত হয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বর দেখা দেয়। ম্যালেরিয়া জ্বরের তীব্রতায় কাঁপুনি আসে এবং জ্বর ১০৪°-১০৬° ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে ডেঙ্গু জ্বরে তেমন কাঁপুনি আসে না এবং তাপমাত্রা ১০৩-১০৫° ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠে থাকে। ৪৮ ঘণ্টা পর পর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসা ম্যালেরিয়া রোগের প্রধান লক্ষণ, তবে মেরুদণ্ডের ব্যথাসহ কোমরে ব্যথা ডেঙ্গু জ্বরের বিশেষ লক্ষণ। ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর লোহিত কণিকা দ্রুত ভাঙতে থাকে, ফলে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। কিন্তু ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর রক্তে প্লাটিলেট ভীষণভাবে কমতে শুরু করে। ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর নাক, মুখ, চোখ, দাঁতের মাড়ি বা ত্বকের নিচে কখনই রক্ত স্রবণ হতে দেখা না গেলেও ডেঙ্গু রোগীর ক্ষেত্রে এর যে কোনোটি ঘটতে পারে।

ঘ. মনি ও মুত্তার জ্বর নিয়ন্ত্রণে অর্থাৎ ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিচে বিশ্লেষণমূলক আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা হলো—

ম্যালেরিয়া জ্বর হলে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে এবং দেরি না করে দ্রুত ডাক্তারের নিকট যেতে হবে। ম্যালেরিয়া জ্বরের অনুমোদিত ওষুধ হলো কুইনাইন। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এ ওষুধ সেবন করতে হবে। ম্যালেরিয়া জ্বরের জীবাণু স্ত্রী *Anopheles* মশকী বহন করে। এ মশকীর দংশনের ফলেই ম্যালেরিয়া জ্বর হয়ে থাকে। তাই ম্যালেরিয়া জ্বর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মশকীর প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস করতে হবে

ঘরে মশারী ব্যবহার করেও জ্বরের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। অন্যদিকে ডেঙ্গু জ্বর হলেও রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে। ডেঙ্গু জ্বরে রোগীকে কখনই আসপিরিন জাতীয় ওষুধ দেওয়া যাবে না। এটি রোগীর মৃত্যু ঘটাতে পারে। ব্যাথা ও জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ দিতে হবে। রোগীকে প্রচুর পানি, ফলের রস ও তরল খাবার দিতে হবে। মাথায় পানি ঢালা, গায়ের ঘাম মুছে দেওয়া, ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর স্পঞ্জ করে দেওয়া রোগীর জন্য ফলদায়ক। এছাড়া *Aedes* মশকী যেহেতু এ রোগের জীবাণু বহন করে তাই এই মশকী নিধনের মাধ্যমেও ডেঙ্গু জ্বরের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এ মশা ময়লা পানিতে জন্মায় তাই ফুলের টব, টায়ার, ড্রাম, খাড়ি-পাতিল ইত্যাদিতে যেন পানি জমে না থাকে সে দিকে নক্ষ রাখতে হবে। উভয় ধরনের জ্বর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এসব পরামর্শ বিশেষজ্ঞের থাকতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৩



- | | |
|---|---|
| ক. কলেরা রোগের জীবাণুর নাম লেখো। | ১ |
| খ. দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করো। | ২ |
| গ. A অণুজীবের গঠন বর্ণনা করো। | ৩ |
| ঘ. মানবকল্যাণে B অণুজীবের ভূমিকা লেখো। | ৪ |

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কলেরা রোগের জীবাণু হলো *Vibrio cholerae* নামক ব্যাকটেরিয়া।
খ. দ্বিবিভাজন হলো আদিকোষী জীবের এক ধরনের অযৌন প্রজনন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে মাতৃকোষটি কিছুটা লম্বাটে হয় এবং কোষটির মধ্যভাগে কোষ প্রাচীরে বলয় আকারে সংকোচন সৃষ্টি হয়। এ সংকোচন ক্রমশ কোষকেন্দ্রের দিকে গভীর হতে থাকে। একই সময়ে কোষের নিউক্লিওবস্তু ডায়েল আকার ধারণ করে। এরপর সংকোচন গভীর হয়ে গেলে নিউক্লিওবস্তুসহ কোষটি দু'ভাগে বিভক্ত হয় এবং দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়। ব্যাকটেরিয়া সাধারণত দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করে থাকে।

গ. চিত্র-A তে দেখানো অণুজীবটি হলো T_২- ব্যাকটেরিওফায়। T_২-ফায় ভাইরাসের দেহকে দুটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়, যথা— মাথা ও লেজ।

T_২-ফায় ভাইরাসের মাথাটি স্ফীত ও ষড়ভুজাকৃতির। এটি প্রোটিন অণু দিয়ে তৈরি। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৩-১০০ nm এবং প্রস্থ ৬৫ nm। থলির মতো এ স্ফীত অংশের ভেতরে দ্বি-সূত্রক একটি DNA অণু প্যাসানো অবস্থায় থাকে। এই DNA-তে ৬০,০০০ জোড়া নিউক্লিওটাইড থাকে। DNA-তে জিন থাকে প্রায় ১৫০টি।

T_২-ফায়ের লেজের প্রধান অংশটি একটি ফাঁপা নলের মতো। লেজটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৫-১১০ nm এবং ব্যাস প্রায় ১৫-২৫ nm। লেজের উপরিভাগে সুস্পষ্ট চাকতির মতো একটি কলার আছে। লেজের অভ্যন্তরে কোনো DNA নেই। নিচের দিকে একটি বেসপ্লেট, কাঁটার মতো ৬টি স্পাইক ও ৬টি স্পর্শক তন্তু আছে। লেজ, কলার, বেসপ্লেট, স্পাইক এবং স্পর্শক তন্তু সবই প্রোটিন দ্বারা গঠিত।

T_২-ব্যাকটেরিওফায় ভাইরাসের দেহে কোনো নিউক্লিয়াস, কোষ প্রাচীর ও অন্য কোনো ক্ষুদ্রাঙ্গ নেই।

ঘ. চিত্র B এর অণুজীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া। মানবকল্যাণে ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাণরক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা তৈরি হয়। বিভিন্ন প্রতিষেধক টিকা যেমন— কলেরা, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, ডি. পি. টি. ইত্যাদি রোগের টিকা ব্যাকটেরিয়া হতে প্রস্তুত করা হয়। কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া মাটির জৈব পদার্থ সঞ্চার করে উর্বরতা বৃদ্ধি করে। নানাবিধ আবর্জনা পচানোর মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া জৈব সার প্রস্তুত করে। কিছু ব্যাকটেরিয়া মাটিতে নাইট্রোজেন স্থাপন করে আবার কিছু ব্যাকটেরিয়া শিম জাতীয় উদ্ভিদের মূলের নডিউলে নাইট্রোজেন সংবন্ধনের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। কিছু ব্যাকটেরিয়া জমিতে ক্ষতিকর পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে আবার কিছু ব্যাকটেরিয়া ফসলের ফলন বৃদ্ধিতেও ব্যবহৃত হয়।

শিল্প ক্ষেত্রেও ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহার ব্যাপক। চা, কফি, তামাক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণে, দুগ্ধজাত শিল্পে, পাট শিল্পে, চামড়া তৈরি, ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি, অ্যাসিটোন তৈরি ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হয়।

মানুষের অন্ত্রের *E. coli* ও অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া ভিটামিন-বি, ভিটামিন-কে, ভিটামিন-বি_{১২}, ফোলিক অ্যাসিড, বায়োটিন প্রভৃতি পদার্থ প্রস্তুত ও সরবরাহ করে থাকে। জিন প্রকৌশলেও ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব অপরিণীম। এছাড়াও আবর্জনা পচনে, পয়ঃনিষ্কাশনে, পানিতে ভাসমান তেল অপসারণেও ব্যাকটেরিয়ার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রেই মানবকল্যাণের জন্য। তাই মানবকল্যাণে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ৪ গবাদি পশু ঘাস ও খড় খায়। এদের প্রধান উপাদান সেলুলোজ। গবাদি পশুর অন্ত্রে বসবাসকারী এক প্রকার কোষীয় জীবাণু সেলুলোজ হজমে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। অপর একটি অকোষীয় জীবাণু এই কোষীয় জীবাণুকে সংক্রমণ করে এর দেহের অভ্যন্তরে সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

/রা. বো. ২০১৫/

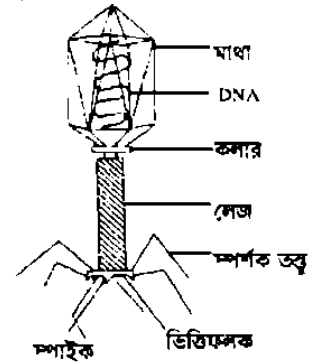
- | | |
|--|---|
| ক. ভাইরাস কী? | ১ |
| খ. হেপাটিক সাইজোগনি বলতে কী বোঝ? | ২ |
| গ. উদ্ভীপকের অকোষীয় জীবাণুটির চিহ্নিত চিত্র আঁক। | ৩ |
| ঘ. উদ্ভীপকের কোষীয় জীবাণুটির বৈজ্ঞানিক নাম লেখো এবং মানবজীবনে এ জীবাণুটি কী কী ভূমিকা রাখতে পারে তা বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ভাইরাস হলো নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত অতি আণুবীক্ষণিক বস্তু যা জীবদেহের অভ্যন্তরে সক্রিয় হয়ে রোগ সৃষ্টি করে কিন্তু জীবদেহের বাইরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে।

খ. সৃজনশীল ১০ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত অকোষীয় জীবাণুটি হলো ফায় ভাইরাস। নিচে একটি ফায় (T_২-ফায়) ভাইরাসের চিহ্নিত চিত্র দেওয়া হলো—



চিত্র : T_২ ফায় ভাইরাস

ঘ. উদ্ভীপকের বর্ণনা থেকে বলা যায়, কোষীয় জীবাণুটি হলো এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া। যার বৈজ্ঞানিক নাম *Escherichia coli*। *E. coli* ব্যাকটেরিয়া মানব জীবনে উপকারী ও অপকারী দুই ধরনের ভূমিকাই রাখতে পারে। যা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

E. coli ব্যাকটেরিয়া ঘূকোজ ও ল্যাকটোজ ভেঙে ফাংশনেশন প্রক্রিয়ায় এসিড ও গ্যাস তৈরি করে। এছাড়া শতকরা ৮৫ ভাগ *E. coli* কোলিসিন (Colicin) বা কোলিব্যাকটেরিন (Colibacterin) নামক প্রতিষেধক তৈরি করে। *E. coli* মানুষের অগ্রে অন্যান্য আত্মিক জীবাণুর সাথে মিলিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের ডিউমিন, বিশেষ করে ডিউমিন K, E এবং B সংশ্লেষণ করে। তাছাড়া এটি বর্তমান সময়ের আলোচিত বিষয় জিন প্রকৌশলে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ইনসুলিন তৈরিতে এবং অ্যান্টিসেপটিক ও অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনে *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে পরীক্ষামূলকভাবে জীবাণু হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আবার ভাইরাসজনিত রোগ, ক্যাপস ও শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিনের গ্রুপ ইন্টারফেরন উৎপাদনের জন্য *E. coli* ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষ করে *E. coli* মানুষের খাদ্য পরিপাক সহায়তা করে।

E. coli এর বিশেষ কিছু প্রকরণ গবেষণার দৃষ্টান্ত পোষ্য শাবকের মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে থাকে। *E. coli* এর কিছু প্রজাতি মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে রক্ত দূষণ, উদরের আনরণ কিরির প্রদাহ, যকৃত ও পিত্তথলির প্রদাহ, ম্যানিফেস্ট ইন্টেক্সট নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি করে। এছাড়া এদের কিছু প্রজাতি শিশুর ডায়রিয়া রোগ সৃষ্টি করে বিশেষ করে মানুষসহ অন্যান্য মেমব্রু প্রাণীর মলের সাথে নির্গত হয়ে *E. coli* পানি ও খাবার দূষিত করে। এতে করে মানুষের মৃত্যুও ঘটতে পারে।

প্রশ্ন ৫ গতরাত থেকে তানিয়ার নমিসহ প্রবল ডায়রিয়া, এতে তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং রক্তচাপ কমে যায়। আবার তার বাম্ধবী রিতা কয়েকদিন ধরে প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত, সাথে শরীরে ব্যথা ও ব্যাশ দেখা গিয়েছে।

//দি. বো. ২০১৭/

- ক. ক্যাপসোমিয়ার কী? ১
- খ. ম্যালেরিয়া পরজীবীর দুটি পোষক প্রয়োজন কেনো? ২
- গ. তানিয়ার রোগটির জন্য দায়ী জীবাণুর একটি আদর্শ গঠনের বর্ণনা দাও। ৩
- রিতার রোগের কারণ ও প্রতিকার, তানিয়ার রোগ থেকে ভিন্ন- বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভাইরাস ক্যাপসিডের প্রতিটি প্রোটিন অণুই হলো ক্যাপসোমিয়ার।

খ ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনচক্র সম্পন্ন করতে যৌন ও অযৌন চক্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অঙ্গর এ চক্র দুটি একটি পোষকদেহে সম্পন্ন হয় না। পরজীবীটি মশকীর দেহে যৌন জনন এবং মানুষের দেহে অযৌন জনন সম্পন্ন করে। সুতরাং পরজীবীটির পূর্ণ জীবনচক্র সম্পন্ন করার জন্যই দুটি পোষক প্রয়োজন।

গ উদ্ভীপকে উল্লিখিত তানিয়ার রোগটি হলো কলেরা। আর এই রোগের জন্য দায়ী জীবাণু হলো ব্যাকটেরিয়া। নিচের ব্যাকটেরিয়ার আদর্শ গঠনের বর্ণনা দেওয়া হলো—

প্রতিটি ব্যাকটেরিয়াম কোষকে ঘিরে একটি জড় কোষ প্রাচীর থাকে। এর প্রধান উপাদান পেনটিডোপ্রাইকান। বহু ব্যাকটেরিয়াতে কোষ প্রাচীরকে ঘিরে জটিল কর্বোহাইড্রেট দিয়ে বা পলিপেপটাইড দিয়ে গঠিত একটি পুরু স্তর থাকে, যাকে ক্যাপসিউল বলে। অনেক ব্যাকটেরিয়াতে একটি ফ্ল্যাগেলাম বা একাধিক ফ্ল্যাগেলা থাকে। ফ্ল্যাগেলা ছাড়াও কোনো ব্যাকটেরিয়াতে খাটো ও শক্ত পিলি থাকে। সাইটোপ্লাজমকে বেষ্টিত করে সজীব প্লাজমামেমব্রেন অবস্থিত। ব্যাকটেরিয়া কোষের প্লাজমামেমব্রেন কখনো কখনো ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে মেসোসোম গঠন করে। সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় সাইটোপ্লাজম অবস্থিত। সাইটোপ্লাজম বর্ণহীন, স্বচ্ছ। এতে বিদ্যমান থাকে ছোট ছোট কোষ গহ্বর, চর্বি, শর্করা জাতীয় খাদ্য, প্রোটিন, খনিজ পদার্থ। সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য অঙ্গাণু হলো মুক্ত রাইবোজোম এবং পলিরাইবোজোম। কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াসের পরিবর্তে কেবল মাত্র একটি ক্রোমোসোম থাকে, যা সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত। বহু ব্যাকটেরিয়াতে বৃহৎ ক্রোমোসোম ছাড়াও একটি ক্ষুদ্রাকার ও বৃত্তাকার ক্রোমোসোম থাকে, যাকে প্লাসমিড বলে।

৫ উদ্ভীপকে উল্লিখিত রিতার রোগের কারণ ও প্রতিকার, তানিয়ার রোগ থেকে ভিন্ন। কারণ—

রিতার রোগের লক্ষণ থেকে বোঝা যায় তার ডেঙ্গু জ্বর হয়েছে যা ভাইরাসজনিত। কারণ কয়েকদিন ধরে প্রচণ্ড জ্বর থাকা, সাথে শরীরে ব্যথা ও ব্যাশ দেখা দেওয়া ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ। আর এ রোগ থেকে প্রতিকারের জন্য প্রথমত অ্যাসপিরিন জাতীয় ঔষধ পরিত্যাগ করতে হবে। ব্যথা ও জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষধ দিতে হয়। রক্তের সাম্যতা রক্ষার জন্য প্লেটিলেট ট্রান্সফিউশন এর প্রয়োজন পড়ে। রোগীকে প্রচুর পানি, ফলের রস ও তরল খাবার দিতে হয়। মাথায় পানি ঢালা, গায়ের ঘাম মুছে নেওয়া, ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর স্পর্শ করে দেওয়া রোগীর জন্য ফলদায়ক হয়।

অপরদিকে তানিয়ার রোগটি হলো কলেরা। এবং তা ব্যাকটেরিয়াজনিত। কারণ বমিসহ প্রবল ডায়রিয়া, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, রক্ত কমে যাওয়া এগুলো সবই কলেরা রোগের লক্ষণ। আর এ রোগের প্রতিকার হলো— কলেরা রোগীর দেহ থেকে অতিমাত্রায় লবণ ও পানি বের হয়ে যায়। তাই পানি ও লবণের সমন্বয়ের জন্য শিরায় স্যালাইন দেওয়া হয়। সাথে ডাবের পানি ও খাবার স্যালাইন দিতে হয়। এছাড়া ডাক্তারের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিতে হয়। মোট কথা রোগীর দেহে যাতে পানিশূন্যতা দেখা না দিতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হয়।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, রিতার রোগের কারণ ও প্রতিকার, তানিয়ার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

প্রশ্ন ৬ রফিক ও শফিক অণুজীব নিয়ে গবেষণাগারে কাজ করেছেন। রফিকের গবেষণার বিষয়বস্তু হচ্ছে অকোষীয় রোগসৃষ্টিকারী অণুজীব এবং শফিকের আদিকোষীয় অণুজীব। রফিকের পর্যবেক্ষণে জানা গেল তার অণুজীব শফিকের অণুজীবকে তক্ষণের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

//দি. বো. ২০১৬/

- ক. মেটাকাইনেসিস কী? ১
- খ. এন্ডেমিক জীব বলতে কী বোঝ? ২
- গ. রফিক ও শফিকের ব্যবহৃত অণুজীব দুটির পার্থক্য করো। ৩
- ঘ. রফিকের পর্যবেক্ষণটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোষ বিভাজনের মেটাফেজ দশায় স্পিন্ডল যন্ত্রের বিমুদীয় অঞ্চলে ক্রোমোসোমের বিন্যস্ত হওয়াকে বলা হয় মেটাকাইনেসিস।

খ যেসব জীব (উদ্ভিদ ও প্রাণী) একটি নির্দিষ্ট প্রাণিভৌগিক অঞ্চল বাস করে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না তাদেরকে ঐ অঞ্চলের এন্ডেমিক জীব বলা হয়। যেমন— চড়িয়াল ওরিগেন্টাল অঞ্চলের এন্ডেমিক প্রাণী। এদেরকে এন্ডেমিক অঞ্চল বাসীও অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

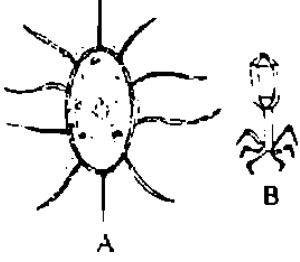
গ রফিকের ব্যবহৃত অণুজীবটি হলো ভাইরাস এবং শফিকের ব্যবহৃত অণুজীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া। নিচে এদের মধ্যে পার্থক্য দেওয়া হলো—

ভাইরাস	ব্যাকটেরিয়া
i. এরা অকোষীয় এবং এতে নিউক্লিয়াস নেই।	i. এরা কোষীয় এবং এতে আদি প্রকৃতির নিউক্লিয়াস থাকে।
ii. এরা সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।	ii. সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে।
iii. এতে সাইটোপ্লাজম বা অন্য কোনো ক্ষুদ্রাঙ্গ নেই।	iii. এতে সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ আছে।
iv. এদের দেহে কোনো এনজাইম থাকে না।	iv. এদের দেহকোষে এনজাইম থাকে।
v. ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিড এর মধ্যে অবস্থান করে।	v. ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিড এর মধ্যে অবস্থান করে না।
vi. এদের মধ্যে DNA বা RNA যেকোনো এক প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।	vi. এদের কোষে DNA ও RNA উভয় প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।

৯. রফিকের ব্যবহৃত অণুজীবটি অর্থাৎ ভাইরাস শফিকের ব্যবহৃত অণুজীব অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া ভ্রূষণের মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি করে। এসব ভাইরাস ব্যাকটেরিওফায় নামে পরিচিত। যেমন— T_2 ফায় ভাইরাস *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে বংশবৃদ্ধি ঘটায়। এর বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—

উত্তরের বাকি অংশ সৃজনশীল ও এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো

প্রশ্ন ▶ ৭



/ক/ বো. ২০১৭/

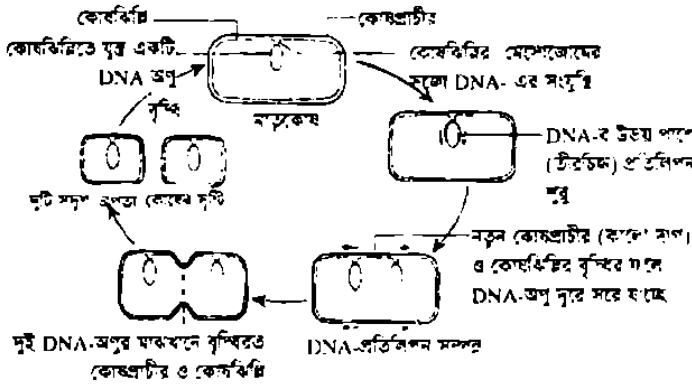
- ক. HIV কী? ১
- খ. হেমোরজিক ডেঞ্জু বনতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত চিত্র A প্রতিনিধিত্বকারী অণুজীবের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি প্রক্রিয়া চিত্রের সাহায্যে দেখাও। ৩
- উদ্ভীপকে উল্লিখিত চিত্র 'B' কে কীভাবে মানব কল্যাণে কাজে লাগানো যায়? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক HIV হলো মানুষের এইডস রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস

খ সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের জটিল রূপই হলো হেমোরজিক ডেঙ্গুজ্বর। এতে কয়েকদিন পর রোগীর নাক, মুখ দাঁতের মাজি ও ত্বকের নিচে রক্তক্ষরণ দেখা দেয়। পায়খানার সাথে রক্ত যেতে পারে। রক্তবমি হতে পারে। রক্তে প্লাটিলেট হ্রাস পায় এবং রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না।

গ উদ্ভীপকে উল্লিখিত চিত্র A হলো ব্যাকটেরিয়া। দ্বি-বিভাজন পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকে। নিচে দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়া চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো।



চিত্র: একটি ব্যাকটেরিয়ামে (*E. coli*) দ্বি-বিভাজন

ঘ উদ্ভীপকে উল্লিখিত চিত্র B হলো T_2 -ব্যাকটেরিওফায় ভাইরাস। মানব কল্যাণে ভাইরাসকে যেভাবে কাজে লাগানো যায় তা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

প্রতিষেধক তৈরিতে: বসন্ত, পোলিও, প্রেগ, টাইফয়েড, জন্যতজ্জ প্রভৃতি রোগের টিকা বা ভ্যাক্সিন তৈরিতে ভাইরাসের বাণিজ্যিক ব্যবহার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

জিনতত্ত্ব ও আণবিক জীববিদ্যায়: জিনতত্ত্বীয় এবং আণবিক জীববিদ্যা (Molecular Biology) বিষয়ক বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষামূলক গবেষণায় ভাইরাস ব্যবহৃত হয়।

ব্যাকটেরিওফায় হিসেবে: কিছু ভাইরাস মানুষের জন্য ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে আমাদের উপকার করে।

iv. ওষুধ হিসেবে: টাইফয়েড, কলেরা, রক্ত আমাশয়, প্রেগ ইত্যাদি নামক ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগে কয়েকটি ফায় ভাইরাস ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

v. পোকামাকড় দমনে: ভাইরাসকে কতিপয় ক্ষতিকারক ও বিপদজনক কীটপতঙ্গ দমনে ব্যবহার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে Nuclear Polyhydrosis Virus-কে পতঙ্গনাশক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়।

vi. বিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণে: জীব সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও বিবর্তনের দ্বারা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে ভাইরাস, কারণ ভাইরাসে একই সাথে জড় এবং জীবের বৈশিষ্ট্যাবলী রয়েছে।

vii. ফুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে: টিউলিপ ফুলের পাপড়িতে বিভিন্ন ছাপ মূলত ভাইরাসের আক্রমণ। ছাপযুক্ত টিউলিপ ফুল সৌন্দর্যের জন্য বিশ্বখ্যাত।

viii. জৈবিক নিয়ন্ত্রণ: বর্তমানকালে জৈবিক নিয়ন্ত্রণে ভাইরাসকে ব্যবহার করা হয়। অস্ট্রেলিয়ায় খর্বগোশ নিয়ন্ত্রণে মিক্সোভাইরাসকে ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ▶ ৮ আসলাম ও শফিক ছাদশ শ্রেণির ছাত্র। উত্তরের বাবা কৃষক। আসলামের একটি পেপের বাগান আছে। আসলাম লক্ষ্য করে পাতার বোটা ও ফলে তৈলাক্ত পানি-সিক্ত গাঢ় সবুজ দাগ সৃষ্টি হয়েছে। পেপে হলুদ হয়ে যায় এবং পুষ্ট হবার আগেই ঝরে পড়ে। শফিক তার বাবার সাথে ধান খেতে গিয়ে দেখে পাতায় ভেজা অর্ধরস্জ লক্ষ্য। দাগের সৃষ্টি হয়েছে। দাগগুলো ক্রমশ হলুদে সাদা বর্ণ ধারণ করেছে। দুই বন্ধু মিলে কলেজের জীববিজ্ঞান শিক্ষকের নিকট থেকে এ সমস্যা দূরীকরণের পরামর্শ গ্রহণ করে উপকৃত হলো।

/ক/ বো. ২০১৬/

- ক. দ্বি-পদ নামকরণ কী? ১
- খ. মাশরুম বনতে কী বোঝ? ২
- গ. জীববিজ্ঞানের শিক্ষক রোগ প্রতিরোধে আসলাম ও শফিককে কী পরামর্শ নিয়েছিলেন? ৩
- আসলাম ও শফিকের সমস্যা একই ধরনের হলেও প্রতিকারের উপায় ভিন্ন। কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ICBN এর নীতিমালা অনুযায়ী একটি গণ ও প্রজাতি নামক দৃষ্টি পদের সমন্বয়ে কোনো জীবের বৈজ্ঞানিক নাম প্রদানই দ্বিপদ নামকরণ।

খ *Agaricus* গণভুক্ত ছত্রাকই মাশরুম নামে পরিচিত। এরা মৃতজীবী ছত্রাক। এদের দেহ মাইসেলিয়াম এবং ফুটবডি এই দুই অংশে বিভক্ত। ফুটবডির নিচের দিকে দণ্ডাকার স্টাইপ এবং স্টাইপের উপরে ছাতার ন্যায় পাইলিয়াস বিদ্যমান। স্টাইপ এবং পাইলিয়াস মিলে ছাতার ন্যায় ফুটবডি গঠন করে বলে এদেরকে ব্যাঙের ছাতা নামেও অভিহিত করা হয়।

গ আসলামের পেপে বাগানের রোগের লক্ষণগুলো দেখে বোঝা যায় যে, পেপে গাছগুলো রিংস্পট রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এটি ভাইরাসঘটিত রোগ। এ রোগ প্রতিরোধে জীববিজ্ঞানের শিক্ষক আসলামকে নিম্নলিখিত পরামর্শ দিয়েছিলেন—

১. রোগ প্রতিরোধক্ষম জাতের চাষ করতে হবে।
২. আক্রান্ত গাছ শনাক্ত করে অপসারণ করতে হবে।
৩. PRSV মুক্ত বীজ থেকে উৎপাদিত চারা জমিতে রোপণ করতে হবে।

৪. PRSV প্রতিরোধকম জাতের পেঁপের চাষ করতে হবে।

৫. আক্রান্ত বাগানের ভেতরে নতুন করে চারা রোপন করা যাবে না।
আবার শফিকের ধানক্ষেতের রোগ লক্ষণগুলো দেখে বোঝা যায় ধান গাছগুলো লিফব্রাইট রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এটি *Xanthomonas oryzae* নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে হয়ে থাকে। এ রোগ প্রতিরোধে শিক্ষক শফিককে নিম্নলিখিত পরামর্শ দিয়েছিলেন—

১. রোগ প্রতিরোধকম প্রকরণ চাষ করতে হবে।
২. বীজ বপনের পূর্বে জমির আগছা বিনাশ করতে হবে।
৩. বীজ বপনের পূর্বে বীজ শোধন করে নিতে হবে।
৪. পাতা না কেটে চারা রোপন করতে হবে এবং নাইট্রোজেন সার সময়মত সঠিক পরিমাণে প্রয়োগ করতে হবে।
৫. জমিতে পানি সেচের সময় ব্রিচিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে।

দৃ আসলাম ও শফিক উভয়ের ফসলেই অণুজীব দ্বারা আক্রান্ত এবং উভয় ফসলেই প্রাথমিক অবস্থায় নাগের সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে রোগ দুটির মিল থাকলেও এদের প্রতিকারের উপায় ভিন্ন।

আসলামের পেঁপে বাগানকে রিংস্পট রোগ থেকে রক্ষার জন্য আক্রান্ত পেঁপে গাছগুলোকে শনাক্ত করে তা বাগান থেকে উপড়ে মাটির নিচে পুতে ফেলতে হবে। সুস্থ সবল গাছগুলোকে ভাল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যাতে পতঙ্গের মাধ্যমে রোগের বিস্তার বাধাগ্রস্ত হয়। যেহেতু এফিড জাতীয় পতঙ্গের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায় সেজন্য পেস্টিসাইড স্প্রে করতে হবে। রোগাক্রান্ত জমিতে পেঁপে গাছের গুনিং বন্ধ রাখতে হবে, কারণ কাটা-ছেড়া স্থান দিয়ে রোগাক্রমণ ঘটে।

আবার শফিকের ধানক্ষেতকে ব্রাইট রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রথমেই আক্রান্ত গাছগুলোকে সরিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রোগাক্রান্ত পাতায় স্ট্রিপটোসাইক্লিন অ্যান্টিবায়োটিক স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়। রোগলক্ষণের সাথে সাথে Granosan M অথবা Agrosan sws প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। জমিতে পানি সেচের সময় তাতে ব্রিচিং পাউডার (২ কে.জি./হেক্টর) ব্যবহার করতে হবে। এতে রোগের প্রকোপ কমে যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আসলাম ও শফিকের সমস্যা একই ধরনের হলেও প্রতিকারের উপায় ভিন্ন।

প্রশ্ন ৯ গ্রুপ A ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত, জলাতঙ্ক
গ্রুপ B যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, টিটেনাস

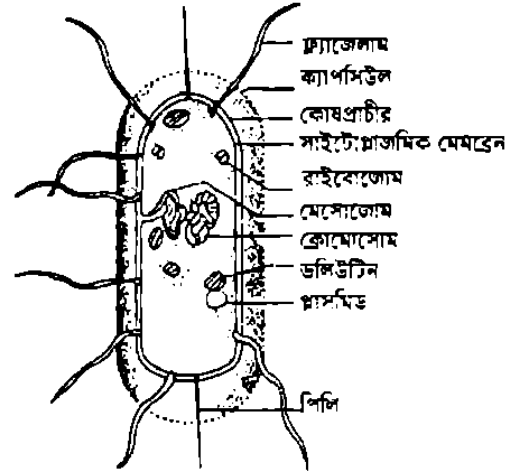
১. ভিরিয়ন কী?
২. ডেঙ্গু কেন মানুষের জন্য বিপদজনক?
৩. গ্রুপ B এর রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের চিহ্নিত চিত্র অংকন করো।
৪. গ্রুপ A এর রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব সর্বদাই অন্যের সহায়তায় বংশবিস্তারে সক্ষম— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিউক্লিক অ্যাসিড ও একে ঘিরে অবস্থিত ক্যাপসিড সমন্বয়ে গঠিত এক একটি সংক্রমণক্ষম সম্পূর্ণ ভাইরাস কণাই হলো ভিরিয়ন।

খ ডেঙ্গু একটি ফ্লাভিভাইরাস জনিত রোগ। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্যথা হয়। হিমোরাজিক ডেঙ্গু জ্বরের ক্ষেত্রে দাঁতের মাড়ি, নাক ও মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়। আত্মক রক্তক্ষরণ হতে পারে। রক্তে অনুচক্রিকা খুব কমে যায়। যথোপযুক্ত চিকিৎসা না হলে রোগী মারাও যেতে পারে। এসকল কারণে ডেঙ্গু মানুষের জন্য বিপদজনক।

গ উদ্ভীপকে উল্লিখিত গ্রুপ 'B' অর্থাৎ যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, টিটেনাস রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া। নিম্নে ব্যাকটেরিয়ার চিহ্নিত চিত্র অংকন করা হলো—



চিত্র : একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়াম কোষ

ঘ উদ্ভীপকে উল্লিখিত গ্রুপ A এর রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব হলো ভাইরাস। ভাইরাসের জীবীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হলো সজীব কোষের অভ্যন্তরে এরা বংশবৃদ্ধি করে। যেমন, T_২ ফায় ভাইরাস *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি করে। ভাইরাস তথা T_২ ফায় এর বংশ বিস্তার বিশ্লেষণ করলে সহজেই বুঝা যায় এরা বংশ বিস্তারের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল। T_২ ফায়ের বংশ বিস্তার—

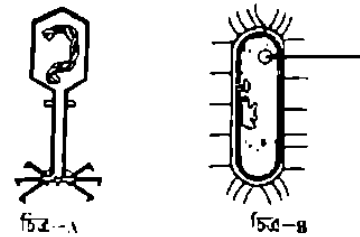
সংক্রমণ পর্যায় : ব্যাকটেরিয়া কোষের সংস্পর্শে আসা হতে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। স্পর্শক তত্ত্বের সাহায্যে এটি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের গায়ে লেগে যায়। লেগে থাকা স্থানের কোষ প্রাচীর ছিন্ন হয়ে যায় এবং ভাইরাস শুধুমাত্র তার জেনেটিক বস্তু (DNA) ব্যাকটেরিয়াম কোষে অন্তঃক্ষেপ দ্বারা প্রবেশ করিয়ে দেয়।

সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায়: ভাইরাস DNA ও প্রোটিন আবরণ গঠন এবং নতুন ভাইরাস গঠন পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের এনজাইমকে সংগঠিত করে অনেক নতুন ভাইরাস DNA এবং সেই সাথে প্রোটিন আবরণ তৈরি করে। শেষ পর্যায়ের DNA ও প্রোটিন আবরণ মিলে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করে।

বিগলন পর্যায় : ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীর ছিন্ন করে নতুন ভাইরাসগুলোর বের হয়ে আসাকে বিগলন পর্যায় বলে। এভাবে মাত্র ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে ৩০০ নতুন ভাইরাস সৃষ্টি হতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, T_২ ফায় ভাইরাস সর্বদাই অন্যের সহায়তায় অর্থাৎ *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার সহায়তায় বংশবিস্তারে সক্ষম।

প্রশ্ন ১০



চিত্র-১

চিত্র-২

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

১. ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণুর নাম লেখো।
২. হেপাটিক সাইজোগনি বলতে কি বোঝায়?
৩. উদ্ভীপকের 'B' চিত্রের গঠন বর্ণনা করো।
৪. 'A' এর বংশ বৃদ্ধিতে 'B' এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণুর নাম *Plasmodium vivax*.

খ মানুষের যুক্ত কণ্ঠে ম্যালেরিয়া পরজীবীর যে অযৌন জনন সম্পন্ন হয় তাকে হেপাটিক সাইজোগনি বলে। হেপাটিক সাইজোগনি নিম্নলিখিত দুটি পর্যায়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যথা- ১. প্রি-এরিশোসাইটিক হেপাটিক সাইজোগনি, ২. এক্সো-এরিশোসাইটিক হেপাটিক সাইজোগনি।

গ উদ্দীপকের চিত্র ১১ হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াম। প্রতিটি ব্যাকটেরিয়াম কোষকে ঘিরে একটি জড় কোষ প্রাচীর থাকে। এর প্রধান উপাদান পেপটোগ্লাইকান। বহু ব্যাকটেরিয়াতে কোষ প্রাচীরকে ঘিরে জটিল কৰ্বেইক্সিড্রেট দিয়ে বা পলিপেপটাইড দিয়ে গঠিত একটি পুরু স্তর থাকে, যাকে ক্যাপসিউল বলে। অনেক ব্যাকটেরিয়াতে একটি ফ্ল্যাজেলাম বা একাধিক ফ্ল্যাজেলা থাকে। ফ্ল্যাজেলা ছাড়াও কোনো ব্যাকটেরিয়াতে খাটো ও শক্ত পিলি থাকে। সাইটোপ্লাজমকে বেস্টন করে সজীব প্লাজমামেমব্রেন অবস্থিত। ব্যাকটেরিয়া কোষের প্লাজমামেমব্রেন কখনো কখনো ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে মেসোসোম গঠন করে। সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় সাইটোপ্লাজম অবস্থিত। সাইটোপ্লাজম বর্ণহীন, স্বচ্ছ। এতে বিদ্যমান থাকে ছোট ছোট কোব গলার, চর্বি, শর্করা জাতীয় খাদ্য, প্রোটিন, খনিজ পদার্থ। সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য অঙ্গাণু হলো মুক্ত রাইবোসোম এবং পলিরাইবোসোম। কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াসের পরিবর্তে কেবল মাত্র একটি ক্রোমোসোম থাকে, যা সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত। বহু ব্যাকটেরিয়াতে বৃহৎ ক্রোমোসোম ছাড়াও একটি ফ্লটাকার ও বৃত্তাকার ক্রোমোসোম থাকে, যাকে প্লাসমিড বলা হয়।

ঘ উদ্দীপকের চিত্র-A হলো T_2 ব্যাকটেরিওফায় এবং চিত্র-B হলো ব্যাকটেরিয়াম (*E. coli*)। যে সকল ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে তাদের ব্যাকটেরিওফায় বলে। T_2 ব্যাকটেরিওফায় তাদের বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়াকে (*E. coli*) আক্রমণ করে এবং তাদের দেহাভ্যন্তরে সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে থাকে। 'A' তথা ব্যাকটেরিওফায়ের সংখ্যাবৃদ্ধি অর্থাৎ বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাদের বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে H-এর গুরুত্ব অপরিসীম। T_2 ব্যাকটেরিওফায় তাদের বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রথমে *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। পরে এনজাইমের কার্যকরিতায় ব্যাকটেরিয়ামের প্রাচীরে ছিদ্র তৈরির মাধ্যমে ফায় DNA ব্যাকটেরিয়াম কোষে প্রবেশ করায় ব্যাকটেরিয়াম কোষের অভ্যন্তরে অসংখ্য ফায় DNA এবং ফায় কোট প্রোটিন তৈরি হয়। ফায় কোট প্রোটিন পরবর্তীতে নতুন ফায়ের মাথা, লেজ, স্পর্শকতন্তু ও স্পাইক তৈরি করে। এরপর অপত্য ফায় DNA এবং অন্যান্য প্রোটিন অংশগুলো যুক্ত হয়ে অসংখ্য নতুন T_2 ফায় তৈরি হয়। সবশেষে ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীর বিগলনের মাধ্যমে অপত্য T_2 ব্যাকটেরিওফায়গুলো বাইরে বের হয়ে আসে। এভাবে 'A' তথা T_2 ফায় তার বংশবৃদ্ধি করে থাকে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, 'A' -এর বংশবৃদ্ধি 'B' তথা ব্যাকটেরিয়ামের অভ্যন্তরেই ঘটে থাকে এবং 'B' এর অনুপস্থিতিতেই 'A' এর বংশবৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপেই অসম্ভব।

সূতরাং বিশ্লেষণমূলক এ আলোচনা শেষে বলা যায় যে, 'A' এর বংশবৃদ্ধিতে 'B' -এর গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ১১ 'X' ও 'Y' উভয়ই জুরে আক্রান্ত হলেও প্রকাশিত লক্ষণ ভিন্ন। 'X' এর প্রচণ্ড মাথা ব্যথাসহ অস্থি সন্ধিতে ব্যথা এবং চামড়ায় লাল ব্যাশ দেখা যাচ্ছে। 'Y' এর কাঁপুনিসহ জ্বর, বমি বমি ভাব ও রক্তস্রাব দেখা দিয়েছে।

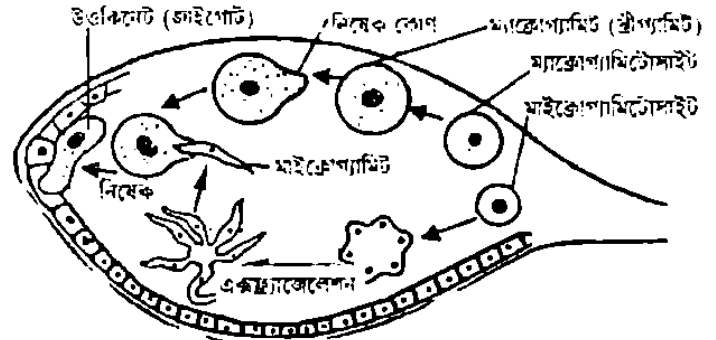
- | | | |
|----|---|---|
| ক. | প্রাজমিড কী? | ১ |
| খ. | লাইটিক চক্র বলতে কী বোঝ? | ২ |
| গ. | 'Y' যে জ্বরে আক্রান্ত সেই জীবাণুটি মশকীর রূপের ভিতর
জীবনচক্রের যে অংশ সম্পন্ন করে তার চিহ্নিত চিত্র দাও। | ৩ |
| ঘ. | 'X' যে জ্বরে আক্রান্ত সেই জীবাণুটিকে জীব ও জড়ের
যোগসূত্র বলা হয়— বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাকটেরিয়ার কোষে ক্রোমোসোম বহির্ভূত গোলাকার স্বতন্ত্র DNA ই হলো প্লাজমিড।

খ. ভাইরাস কোনো পোষক কোষ আক্রমণের সময় পোষক কোষে বংশগতীয় বস্তু প্রবেশের পর ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে পারে। পোষক কোষ ভেঙে যখন অনেকগুলো ভিরিয়ন মুক্ত হয় তখন সেই অবস্থাকে ভাইরাসের লাইটিক চক্র বলে। যেমন— *E.coli* কে আক্রমণকারী T₂ ফায় ভাইরাসে লাইটিক চক্র সম্পন্ন হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'Y' ম্যালেরিয়া। জ্বরে আক্রান্ত। মশকীর ক্রূপের ভিতর গ্যামিট সৃষ্টির মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার জীবাণুর যৌন প্রজনন সম্পন্ন হয়, যাতে গ্যামিটোগনি বলে মশকীর ক্রূপের ভেতর ম্যালেরিয়া জীবাণু যে যৌন প্রজনন বা গ্যামিটোগনি সম্পন্ন করে তার চিহ্নিত চিত্র নিম্নে দেওয়া হলো -



চিত্র: মশকীর ক্রূপের ভিতর *Plasmodium*-এর গ্যামিটোগনি

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত। ডেঙ্গু একটি ভাইরাসঘটিত রোগ। ভাইরাস অতি আণুবীক্ষণিক অকোষীয় বস্তু যা প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে গঠিত। ভাইরাসের মধ্যে জীবীয় এবং জড় উভয় বৈশিষ্ট্যই লক্ষ করা যায়। ভাইরাস সজীব কোষের অভ্যন্তরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে, পাশাপাশি এদের মধ্যে প্রকরণ সৃষ্টি ও পরিবাহিত্ব ঘটতেও দেখা যায়। এসব জীবীয় বৈশিষ্ট্য। আবার, সজীব কোষের বাইরে ভাইরাস কোনো জৈবিক কার্যকলাপ ঘটাতে পারে না এবং এদের কোনো সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস, বিপাকীয় এনজাইম কিছুই থাকে না— যেনো জড় বৈশিষ্ট্য। জীব ও জড় উভয় প্রকার বৈশিষ্ট্য ভাইরাসে পরিলক্ষিত হয় বলেই ভাইরাসকে জীব ও জড়ের যোগসূত্র বলা হয়।

প্রশ্ন ১২: জীববিজ্ঞান ক্লাসে জামী শিখেছে যে কিছু অদিকেন্দ্রিক আণুবীক্ষণিক অণুজীব আছে যাদের দেহে বংশগতির উপাদান ছাড়াও বৃত্তাকার DNA থাকে এবং এদের অনেকেই আমাদের জন্য উপকারী। এছাড়া আরেক ধরনের অণুজীব আছে যরা উভচরীয় এবং অন্যান্য জীবের স্বতিসাধন করে।
(৪ বো. ২০১৬)

- ক. কলরা জীবাণুর বৈজ্ঞানিক নাম কিসের? ১
- খ. মেরোজাইগোট বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. দ্বিতীয় অণুজীৱটি প্রথম ভরজীৱকে বহনকার করে কিভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায়? ৩
- গ. জীবজগতে ভরজীৱ নষ্টের উপস্থিতি নিয়ে বিশ্লেষণ করো ৪

੧੨ ਨਾਂ ਭਾਗਤ ਭੇਡ

क कलत्रा जीरागुड दैह्यन्ति नः - *... cholerae.*

খ কতিপয় ব্যক্তিরইহক তিন জনের সময় দাতা কোষের আংশিক ক্রোমোসোমের স্তর প্রকৃত ভাবে সম্পূর্ণ ক্রোমোসোমের মিলনের মাধ্যমে যে জাইগোট গঠিত হয় তাই মেরোজাইগোট প্রকৃতকোষী জাইগোটের মতো এটি ভ্রূণের ভাবে ন এবং এতে কোনো সংখ্যাবৃদ্ধিও ঘটে না।

গ উদ্দীপকের প্রথম অণুজীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া এবং দ্বিতীয় অণুজীবটি হলো ভাইরাস। কিন্তু ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে ব্যাকটেরিয়া কোষের মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি করে থাকে। যেমন— T_২ ফায় ভাইরাস *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে। এর সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে তিনটি পর্যায় ভাগ করা যায়—

উত্তরের বাকি অংশ স্তম্ভগুলি ৫ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

য। জীবজগতে অণুজীব দুটি অর্থাৎ ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের বিভিন্ন উপকারি দিক রয়েছে। এর মধ্যে ভাইরাস দিয়ে বসন্ত, পোলিও, প্রেং, জডিস ও জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক টিকা তৈরি করা হয়। কতিপয় ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ দমনেও ভাইরাসের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। লাল টিউলিপ ফুলে ভাইরাস আক্রমণের ফলে বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়, এর ফলে ফুলের সৌন্দর্য এবং বাজারমূল্য বৃদ্ধি পায়।

আবার বিভিন্ন খরনের প্রতিরক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিক আমরা ব্যাকটেরিয়া থেকে পেয়ে থাকি। কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি করা হয়। কিছু ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন সংবন্ধনের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। দুধ থেকে পনির, দই, মাখন, ছানা তৈরিতেও ব্যাকটেরিয়া প্রয়োজন হয়। পাটের আঁশ ছাড়তে ব্যাকটেরিয়া বিশেষ ভূমিকা পালন করে। চা, কফি ও তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যাকটেরিয়া নিঃসৃত এনজাইমের প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন ১৩ রফিকের জ্বর। ডাক্তার তার রক্ত পরীক্ষা করে বললেন, জ্বরের কারণ মশকী বাহিত এক কোষী জীব যা মানুষের যকৃত কোষ ও লোহিত কণিকা ধ্বংস করে।

(৮. নং. ২০১৬/)

- ক. লাইকেন কী? ১
- খ. ব্যাকটেরিওফায় বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্ভীপকের রোগের জীবাণুর নাম ও রোগ লক্ষণ লেখো। ৩
- ঘ. রফিকের জ্বরের কারণ বিশ্লেষণ করো ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক। শৈবাল ও ছত্রাক মিলিতভাবে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের যে উদ্ভিদের সৃষ্টি করে তা হলো লাইকেন

খ। যেসব ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করার মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে এবং ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে তাদেরকে বলা হয় ব্যাকটেরিওফায়। ফায় এর জেনেটিক বস্তু ব্যাকটেরিয়ামের দেহে প্রবেশ করে এবং এক সময় ব্যাকটেরিয়া কোষটি ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন : T_২-ব্যাকটেরিওফায় E. coli- কে আক্রমণ করে বংশবৃদ্ধি করে।

গ। উদ্ভীপকে উল্লিখিত রফিক ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত। ম্যালেরিয়া একটি গলকী বাহিত রোগ। এই রোগের জীবাণুর নাম Plasmodium vivax.

ম্যালেরিয়া রোগ হলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়—
প্রাথমিক পর্যায়ে মাথাধরা, বমি বমি ভাব, অনিদ্রা ইত্যাদি দেখা যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে রোগীর গীত অনুভূত হয় এবং কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। জ্বর ১০৫°-১০৬° ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে। কয়েক ঘণ্টা পর জ্বর কমে যায়। তৃতীয় পর্যায়ে রোগীর দেহে জীবাণুর সংখ্যা অসম্ভবভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণে দ্রুত রক্তের লোহিত কণিকা ডাঙতে থাকে। রক্তশূন্যতা দেখা দেয়, প্লীহা ও মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

ঘ। রফিক ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত ধারণা করা হতো যে পরজীবীর দেহ থেকে নিঃসৃত হিমোজেন নামক বিষাক্ত রক্তক পদার্থের কারণে বা কোনো বিষবস্তু ক্ষরণের ফলে মানুষের দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং জ্বর আসে। কিন্তু বর্তমান ধারণা অনুযায়ী ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত মানুষের দেহের লোহিত রক্ত কণিকার প্রাচীর ভেঙে মেরোজয়েটগুলো রক্তরসে প্রবেশ করে। মেরোজয়েটগুলো বহিরাগত বস্তু যা রক্তের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করে দেয়। এ বহিরাগত বস্তুগুলোকে ধ্বংস করার জন্য রক্তের স্বেতকণিকা পাইরোজেন নামক এক প্রকার পদার্থ ক্ষরণ করে। স্বেতকণিকা যখন অতিরিক্ত পাইরোজেন ক্ষরণ করে তখন মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অংশ, বিশেষ করে তাপসংবেদী কোষগুলো উদ্ভীপ্ত হয়। তখন প্রোস্টাগ্যান্ডিন, মনোঅ্যামাইন প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ বেড়িয়ে আসে। এ খবর হাইপোথ্যালামাসের পেছন দিকটায় পৌঁছালে ভেসোমোটর স্নায়ুতন্তু উত্তেজিত হয়। এ উত্তেজনা দেহের প্রান্তীয় অঙ্গুলের রক্তনালিগুলোকে সংকুচিত করে ফলে দেহ থেকে

অতিরিক্ত তাপ বের হতে পারে না। এ কারণেই দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় অনেক বেড়ে যায়। দেহের এ তাপ বৃদ্ধিকে জ্বর বলে। ঠিক এ কারণেই রফিকের শরীরে জ্বর আসে

প্রশ্ন ১৪ রনি ও মনি পরীক্ষা শেষে শহরে মামার বাড়িতে বেড়াতে গেলে সপ্তাহখানেক পর দেখা গেল রনির প্রচণ্ড জ্বরসহ শরীরে লালচে রক্তের র্যাশ এবং মনির বমিসহ চালধোয়া পানির মত মল ত্যাগ করার লক্ষণ দেখা দিল।

(৮. নং. ২০১৫/)

- ক. জেনেটিক কোড কী? ১
- খ. সাইকাসের মূলকে কোরালয়েড মূল বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত রনি ও মনির রোগের নাম উল্লেখসহ রোগ নিয়ন্ত্রণে ডাক্তারের পরামর্শগুলো লেখো। ৩
- ঘ. উভয়ের রোগ বিস্তারের ক্ষেত্রে পরিবেশীয় গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক। নিউক্লিওটাইড বা নাইট্রোজেন বেসের যে গ্রুপ কোন অ্যামিনো অ্যাসিডের সংকেত গঠন করে তাই হলো বংশগতীয় সংকেত বা জেনেটিক কোড।

খ। সাইকাস উদ্ভিদের প্রধান মূল স্বল্পস্থায়ী। সে কারণে গোড়ায় অস্থানিক মূল সৃষ্টি হয়। অস্থানিক মূল থেকে কিছু শাখামূল মাটির উপরের দিকে উঠে আসে এবং খুব ঘনভাবে ছাত্র শাখা বিন্যাস গড়ে তোলে। মূলগুলো এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ ছাড়া সেখানে Nostoc, Anabaena নামক সাইনোব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কোরালের মতো দেখায়। তাই সাইকাসের মূলকে কোরালয়েড মূল বলা হয়।

গ। উদ্ভীপকে উল্লিখিত রনি ডেঙ্গু জ্বরে এবং মনি কলেরা রোগে আক্রান্ত। রনির রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ হবে—

এ রোগে রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থাকায় অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ পরিহার করা। রক্তের সাম্যতা রক্ষার জন্য প্লাটিলেট ট্রান্সফিউশন বা রক্তদান। জ্বরের তীব্রতায় রোগীর মাথায় পানি দেয়া। রনিকে প্রচুর পরিমাণ পানি ও তরল খাবার খেতে দেয়া। রোগীর অবস্থা জটিল হলে অবশ্যই হাসপাতালে নিতে হবে।

মনির রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ হবে—

মনিকে খাবার স্যালাইন বা ওরাল স্যালাইন বার বার পান করানো এতে রোগী ডিহাইড্রেশনে আক্রান্ত হয় না এবং দ্রুত রোগ নিরাময় ঘটে। মনি মুখে খাবার স্যালাইন খেতে না পারলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে শিরায় স্যালাইন দেয়া। তাকে প্রচুর তরল খাবার খেতে দেয়া। তাকে বিশ্রামে রাখা। এছাড়া ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী টেট্রাসাইক্লিন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক মনিকে দেয়া যেতে পারে।

ঘ। রনি ও মনির রোগলক্ষণ বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে, রনি ডেঙ্গু ও মনি কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়েছে। উভয়ের রোগ বিস্তারের ক্ষেত্রে পরিবেশের অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে

ডেঙ্গু রোগ বিস্তারে পরিবেশীয় গুরুত্ব: ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত রোগ। এডিস প্রজাতির মশকী ডেঙ্গু ভাইরাসের বাহক হিসেবে কাজ করে ও সংক্রমণ ঘটায়। আবস্থ পরিষ্কার পানিতে এডিস মশার বংশবিস্তার ঘটে। পরিত্যক্ত টায়ার, ফুলের টব, এয়ার কুলার বা ফ্রিজের নিচের অংশ, ভাজা কাচ বা মাটির পাত্র প্রভৃতি, যেখানে পানি বেশ কয়েকদিন আবস্থ থাকে এমন স্থানে এডিস মশা বসবাস করে। ডেঙ্গু সংক্রমিত এডিস মশা মানুষকে দংশন করলে মশকীর লালার সাথে জীবাণু মানবদেহে প্রবেশ করে। তাই পরিবেশে এডিস মশা বসবাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা অর্থাৎ বেশ কিছুদিন আবস্থ পরিষ্কার পানি কোথাও জমে থাকলে তা ডেঙ্গু রোগ বিস্তারে অনুকূল ভূমিকা পালন করে।

কলেরা রোগ বিস্তারে পরিবেশীয় গুরুত্ব: কলেরা একটি ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ। কলেরা জীবাণু দূষিত খাবার অথবা পানি গ্রহণ করলে মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়। রোগীর মলমূত্রের মাধ্যমেও এ রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। যেসব অঞ্চলে পয়ঃনিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ

খাবার পানির যথাযথ ব্যবস্থা নেই সেসব অঞ্চলে কলেরা দ্রুত বিস্তার লাভ করে থাকে। সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল এবং নোনাপানির নদ-নদীতে কলেরার জীবাণু বেঁচে থাকতে পারে। এছাড়া কঠিনাস্থি মাছ, কাকড়া, ঝিনুক, শামুক ও চিংড়ির মধ্যেও কলেরা জীবাণু বেঁচে থাকে এবং তা কলেরার উৎস হয়ে দাঁড়াতে পারে। সাধারণত আক্রান্ত রোগীর মল, দূষিত পানি এবং খাদ্যের মাধ্যমে কলেরা জীবাণুর প্রাথমিক সংক্রমণ ঘটে। কলেরা রোগীর বমি, বিছানাপত্র, পানি, খাদ্য ও মাছি দ্বারা রোগের গৌণ সংক্রমণ ঘটে। তাই কলেরা রোগের বিস্তারের ক্ষেত্রেও পরিবেশীয় গুরুত্ব অপরিণীম।

প্রশ্ন ১৫ একটি জীবাণুর ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি তাদের জীবনচক্রের আনুমানিক কিছু পর্যায়ে সম্পন্ন করতে গিয়ে মানুষসহ বিভিন্ন মেবুদন্তী প্রাণীতে একটি রোগের সৃষ্টি করে এবং একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির মশকীর মাধ্যমে রোগটি ছড়ায়।

(ময়মনসিংহ পার্স ক্যাডেট স্কুল/)

- ক. পাম ফার্ন কী? ১
- খ. ক্যারিওগ্যামী বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উক্ত জীবাণুটির স্পোরের বর্ণনা দাও যা প্রথমোক্ত জীবকে আক্রমণ করে। ৩
- ঘ. উক্ত রোগটির জীবাণুর জীবনচক্র শেষোক্ত জীবটি ছাড়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পাম উদ্ভিদ ও ফার্নের পাতার সাথে সাইকাসের পাতা কিছুটা মিলসম্পন্ন হওয়ায় অনেক সময় সাইকাস উদ্ভিদকে পাম ফার্ন বলা হয়।

খ. যৌন জননের ক্ষেত্রে দুটি হ্যাপ্লয়েড আদিকোষী জনন কোষের মিলনের শেষ ধাপ হলো ক্যারিওগ্যামী যেখানে জনন কোষ দুটির নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটে। গ্যামিট বা জনন কোষ সৃষ্টির পর প্রোটোপ্লাজমের মিলন ঘটে তারপর নিউক্লিয়াসের মিলনের মাধ্যমে যৌন জনন সম্পন্ন হয়। হত্মাকে এ ধরনের যৌন জনন দেখা যায়।

গ. উক্ত জীবাণুটি হলো প্রাজমোডিয়াম। প্রাজমোডিয়ামের স্পোরোজয়েট দশা প্রথমোক্ত জীব অর্থাৎ মানুষকে আক্রমণ করে।

মানবদেহে স্পোরোজয়েট প্রবেশের পর প্রথম এক সপ্তাহে প্রি-এরিত্রোসাইটিক সাইজোগনি পর্যায়ের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। এতে স্পোরোজয়েট, ক্রিন্টোজয়েট, সাইজন্ট ও ক্রিন্টোমেরোজয়েট ধাপগুলো দেখা যায়। স্পোরোজয়েটগুলো রক্তরস থেকে যুক্ত কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং এখানেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যুক্ত কোষ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে স্পোরোজয়েটগুলো গোলাকার ক্রিন্টোজয়েটে পরিণত হয়। প্রতিটি ক্রিন্টোজয়েট ক্রমাগত নিউক্লিয়াস বিভাজনের মাধ্যমে বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত সাইজন্ট দশায় উপনীত হয়। সাইজন্টের প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সাইটোপ্লাজম জমা হয়ে নতুন কোষের সৃষ্টি হয় যা ক্রিন্টোমেরোজয়েট নামে পরিচিত। পরিণত ক্রিন্টোমেরোজয়েটগুলো সাইজন্টের প্রাচীর বিদীর্ণ করে যুক্তের সাইনুসয়েড এ আশ্রয় নেয়।

এভাবে ম্যালেরিয়া পরজীবী নিপার যুক্ত প্রি-এরিত্রোসাইটিক সাইজোগনি সম্পন্ন পর উৎপন্ন মেরোজয়েটগুলো নতুন যুক্তকোষকে আক্রমণের মাধ্যমে এক্সোএরিত্রোসাইটিক সাইজোগনির সূচনা করে, যা পরবর্তীতে সাইজন্ট দশায় পৌঁছায়। সাইজন্ট দশা থেকে পূর্বে বর্ণিত নিয়মেই বিভক্ত নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সাইটোপ্লাজম জমা হওয়ার মাধ্যমে নতুন কোষ সৃষ্টি হয়, যাদেরকে মেটাক্রিন্টোমেরোজয়েট বলে।

ঘ. উদ্ভীপকে নির্দেশিত রোগটি হলো ম্যালেরিয়া জ্বর এবং শেষোক্ত জীবটি ম্যালেরিয়া জীবাণুর বাহক ও পোষক *Anopheles* গণের মশকী। ম্যালেরিয়া *Plasmodium* পরজীবীর আক্রমণে হয়ে থাকে। ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু *Plasmodium* এর জীবনচক্র সম্পন্ন করতে অবশ্যই মানুষের দেহ এবং মশকী প্রয়োজন। কারণ জীবন চক্রের যৌন দশাটি মশকীর দেহে এবং অযৌন দশাটি মানুষের দেহে সম্পন্ন হয়।

এখানে মশকীর দেহে প্রথমে দু'প্রকার গ্যামিটোসাইট প্রবেশ করে সেখানে তারা মিলিত হয়ে জাইগোট উৎপন্ন করে। জাইগোটটি শ্লেষ মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে স্পোরোজয়েট উৎপন্ন করে।

স্পোরোজয়েট পুনরায় মশকীর দেহে আক্রমণ করে না বরং মানুষের দেহে চলে আসে। এরপর স্পোরোজয়েট প্রথমে যুক্ত কোষ ও পরে লোহিত রক্তকণিকা পরজীবী শুধুমাত্র অযৌন চক্রের মাধ্যমে বারবার সাইজোগনি সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু যৌন চক্রের জন্য অবশ্যই মশকী প্রয়োজন। সুতরাং আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে উক্ত জীবাণুর জীবনচক্র শেষোক্ত জীব অর্থাৎ মশকী ছাড়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ১৬ স্ত্রী *Anopheles* মশায় সুনির্দিষ্ট পরজীবীর গ্যামিটোসাইট ধ্বংসের জন্য কোনো এনজাইম থাকে না, যা মানুষের দেহে নির্দিষ্ট সময় পর পর জ্বর আসার জন্য দায়ী।

(রাজশাহী ক্যাডেট স্কুল/)

- ক. মাধ্যমিক পোষক কী? ১
- খ. এনজাইমের ক্রিয়া প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্ভীপকের পরজীবী মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় উপস্থিত থাকলে কী ঘটবে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্ভীপকের রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যেসব পোষকের দেহে অযৌন জনন সম্পন্ন হয় এবং লার্ভা দশা অতিক্রান্ত হয়, সেসব পোষকই হলো মাধ্যমিক পোষক।

খ. কোনো নির্দিষ্ট এনজাইমের এক বা একাধিক সক্রিয় স্থান থাকে। পলিপেপটাইড চেইনের ফলডিং-এর মাধ্যমে অ্যাকটিভ সাইট সৃষ্টি হয়। অ্যাকটিভ সাইট ও সাবস্ট্রেটের সম্পর্ক হলো তালা-চাবির মতো সুনির্দিষ্ট। এক্ষেত্রে প্রথমে সাবস্ট্রেট অণু এনজাইমের সক্রিয় স্থান তথা 'অ্যাকটিভ সাইট'-এ সংযুক্ত হয়ে এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ সৃষ্টি করে দ্বিতীয় পর্যায়ে এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ ভেঙে গিয়ে নতুন পদার্থ সৃষ্টি হয় এবং এনজাইম অপরিবর্তিতভাবে পৃথক হয়ে যায়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইট-এ সাবস্ট্রেট সঠিকভাবে 'fit' হয় না। এসব ক্ষেত্রে সাবস্ট্রেট অ্যাকটিভ সাইট-এ সংযুক্ত হলে পুরো এনজাইমের আকার পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এনজাইম সাবস্ট্রেটকে সঠিকভাবে অ্যাকটিভ সাইট-এ 'fit' করে নেয়। একে বলা হয় 'induced fit'। এনজাইম-সাবস্ট্রেট এর কার্যকরী শক্তি কম। তাই কম কার্যকরী শক্তিসম্পন্ন সাবস্ট্রেট অণু এনজাইমের সাথে যুক্ত হয়ে এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ সৃষ্টি করে, ফলে বিক্রিয়ার হার বেড়ে যায়।

গ. উদ্ভীপকের পরজীবীটি হলো ম্যালেরিয়ার জীবাণু। অণুজীবটি মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় উপস্থিত থেকে তার জীবনচক্র সম্পন্ন করে, যাকে এরিত্রোসাইটিক সাইজোগনি বলে। মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় এর জীবনচক্রের ধাপগুলোর বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো:

১. যুক্ত কোষে সৃষ্টি মেটাক্রিন্টোমেরোজয়েট লোহিত রক্তকণিকায় প্রবেশ করে এবং খাদ্য গ্রহণ করে স্ফীত ও গোলাকার হয়। এই দশাকে ট্রফোজয়েট বলে।
২. পরবর্তীতে অণুজীবটি ভাংগি আকৃতি লাভ করে। এই অবস্থাকে সিগনেট রিং দশা বলে। এই অবস্থায় জীবাণু কোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম এত দূরে থাকে।
৩. এই অবস্থায় জীবন আর্মিবয়েড আকৃতি প্রাপ্ত হয়ে অ্যামিবয়েড ট্রফোজয়েট দশা সৃষ্টি করে।
৪. অ্যামিবয়েড দশার অবস্থায় নিউক্লিয়াস বারবার বিভাজনের মাধ্যমে বহু নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে এবং বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট এই অবস্থাকে সাইজন্ট দশা বলা হয়।
৫. সাইজন্ট দশার প্রতিটি নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম ও ট্রফোজয়েট দশার মেরোজয়েট এ পরিণত হয়। এই দশাকে ট্রফোজয়েট দশা বলে। মেরোজয়েটগুলো এমনভাবে সজ্জিত হয় যেন এটি ছড়ানো হয়।

৬. পরবর্তীতে লোহিত রক্তকণিকা কোষ ডেজো যায় এবং মেরোজয়েটগুলো প্রাজন্ম্য বের হয়ে আসে। মেরোজয়েটগুলো রক্তস্রোতে ঢুকে গেলে শ্বেত রক্তকণিকা প্রতিরোধের চেষ্টা করে এতে প্রচুর পাইরোজেন নামক রাসায়নিক পদার্থ জমা হয় এবং এর প্রভাবেই জ্বর আসে।

৭. মৃত্ত মেরোজয়েট নতুন লোহিত কণাকে আক্রমণ করে এবং একইভাবে চক্রটি পূরণ করে।

১. উদ্দীপকে বর্ণিত রোগটি হলো ম্যালেরিয়া। এ রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো—

প্রতিকার ব্যবস্থা: ম্যালেরিয়া যেহেতু মশকী বাহিত একটি রোগ তাই মশকী প্রতিরোধের মাধ্যমে এ রোগ হতে মুক্ত থাকা সম্ভব। ম্যালেরিয়া প্রতিকার ২ ভাগে হতে পারে; যথা— (ক) মশকী নিধন, (খ) মশকী হতে আশ্রয়রক্ষা।

(ক) মশকী নিধন: মশককুলের বংশ পরিবেশ হতে নির্মূল করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করে এদের বিস্তার রোধ করা যায়—

(i) প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস: মশকীর বংশ পচা পানিতে ডিম পাড়ে। তাই বাড়ির আশেপাশের পরিত্যক্ত ডোবা, নালা পরিষ্কার রাখা, যেখানে সেখানে পানি জমতে না দেয়া, বাড়ির আশেপাশের ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল কেটে ফেলার মাধ্যমে মশকীর বসবাস ও প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস করা সম্ভব।

(ii) লার্ভা ও পিউপা ধ্বংস করা: পচা পানিতে ডিম ফুটে মশকীর লার্ভা ও পিউপা দশা সৃষ্টি হয়। পানিতে কেরোসিন বা পেট্রোল জাতীয় পদার্থ ছিটিয়ে দিলে এরা অক্সিজেনের অভাবে মারা পড়ে। এছাড়া বিএইচসি (BHC), ডায়েলড্রিন ইত্যাদি কীটনাশক পানিতে ছিটিয়ে দিলে মশকীর লার্ভা ও পিউপা মারা যায়। পানিতে জুভেনাইল হরমোন ছিটিয়ে দিলে, লার্ভাগুলোর বৃদ্ধির ব্যাহত হয় ফলে এরা পূর্ণাঙ্গ মশকীতে বৃদ্ধির হতে পারে না।

(iii) পূর্ণাঙ্গ মশককুল নিধন: ফগিং মেশিনের মাধ্যমে সালফার ডাই-অক্সাইডের ধোঁয়া সৃষ্টি করে মশা তাড়ানো বা মেরে ফেলা সম্ভব। এছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ছিটিয়ে বা রেডিয়েশন এর মাধ্যমে বন্যপ্রাণ সৃষ্টি করে মশককুলকে ধ্বংস করা যায়।

(খ) মশকী হতে আশ্রয়রক্ষা: ঘরের দরজা বা জানালায় মশকীরোধী নেট ব্যবহার করে মশকীর দংশন হতে আশ্রয়রক্ষা করা যায়। এছাড়া কয়েল বা বিভিন্ন ধরনের স্প্রে ব্যবহার করা বা দেহের অনাবৃত অংশে বিশেষ ধরনের ক্রিম বা লোশন লাগানোর মাধ্যমে মশকীর দংশন হতে বাঁচা যায়। শয়নের সময় মশারি ব্যবহার করতে হবে। সন্ধ্যায় ধূপের ধোঁয়া প্রয়োগ করা যায়।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা: ম্যালেরিয়া রোগীকে অবশ্যই উন্নত চিকিৎসা প্রদান করা আবশ্যিক। রোগ শনাক্ত করা ও উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান করলে ম্যালেরিয়া রোগ হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সিনকোনা গাছের বাকল হতে তৈরি কুইনাইন ম্যালেরিয়া নিরাময়ের মূল ঔষধ। এ কুইনাইন দ্বারা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ তৈরি হয়েছে। যেমন— ক্লোরোকুইন, নিডাকুইন, কেমোকুইন, অ্যাডলোক্লোর, প্যালাড্রিন ইত্যাদিসহ ম্যালেরিয়া পরজীবী ধ্বংসের ভালো মানের বেশ কিছু ঔষধ বাজারে পাওয়া যায়। এছাড়া আক্রান্ত রোগীকে যাতে মশকী দংশন করতে না পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া আবশ্যিক, নতুবা দ্রুত রোগের বিস্তার ঘটতে পারে।

প্রশ্ন ১৭ ম্যালেরিয়ার জীবাণুর জীবনচক্র সম্পন্ন করতে একটি মেবুদন্তী এবং একটি অমেবুদন্তী পোষকের প্রয়োজন।

[পাবনা ক্যাডেট কলেজ]

- ক. গাইকোলাইসিস কী? ১
- খ. C_3 চক্র এবং C_4 চক্রের মধ্যে পার্থক্য লেখো। ২
- গ. উদ্দীপকের পরজীবীর জীবনচক্র সম্পন্ন করতে দুটি পোষকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেখো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের পরজীবী অমেবুদন্তী পোষকের মধ্যে কীভাবে তার গ্যামিটোগনি দশা সম্পন্ন করে তা ব্যাখ্যা করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জারিত হয়ে দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয় তাই গাইকোলাইসিস

খ. C_3 ও C_4 চক্রের পার্থক্য —

C_3 চক্র	C_4 চক্র
i. রাইবুলোজ ১, ৫-বিসফসফেট হলো CO_2 -এর প্রথম গ্রাহক।	i. ফসফোইনল পাইরুভিক এসিড হলো CO_2 -এর প্রথম গ্রাহক।
ii. প্রথম স্থায়ী পদার্থ ৩-কার্বনবিশিষ্ট ৩-ফসফোগ্লিসারিক এসিড।	ii. প্রথম স্থায়ী পদার্থ ৪-কার্বনবিশিষ্ট অক্সালো এসিটিক এসিড।
iii. অধিক আলোর প্রখরতায় C_3 চক্র চলে না।	iii. অধিক আলোর প্রখরতায় C_4 চক্র চলতে পারে।
iv. C_3 চক্রের জন্য পরম তাপমাত্রা হলো $10^\circ - 25^\circ$ সে.।	iv. C_4 চক্রের জন্য পরম তাপমাত্রা হলো $30^\circ - 85^\circ$ সে.।

গ. উদ্দীপকের পরজীবীর জীবনচক্র সম্পন্ন করতে দুটি পোষকের প্রয়োজন হয়। পোষক দুটি হলো মানুষের দেহ এবং মশকী। কারণ জীবনচক্রের যৌন দশাটি মশকীর দেহে এবং অযৌন দশাটি মানুষের দেহে সম্পন্ন হয়।

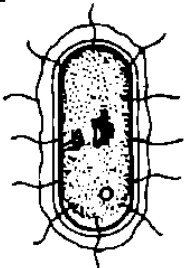
মশকীর দেহে প্রথমে দু'প্রকার গ্যামিটোসাইট প্রবেশ করে, এরপর তারা মিলিত হয়ে জাইগোট উৎপন্ন করে। জাইগোটটি মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে স্পোরোজয়েট উৎপন্ন করে। উৎপন্ন স্পোরোজয়েট পুনরায় মশকীর দেহে আক্রমণ না করে মানুষের দেহে চলে আসে। এরপর স্পোরোজয়েট প্রথমে মানুষের যকৃত কোষ ও পরে লোহিত রক্তকণিকা আক্রমণ করে এবং সেখানে অযৌন জনন ঘটায়। তবে মানুষের দেহে পরজীবী শূণ্য অযৌন চক্রের মাধ্যমেই বারবার সাইজোগনি সম্পন্ন করতে পারে এবং যৌন চক্রের জন্য অবশ্যই মশকী প্রয়োজন।

সূত্রের উপরের আলোচনা থেকে সম্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, পরজীবীটির জীবনচক্র সম্পূর্ণ করতে দুটি পোষক আবশ্যিক।

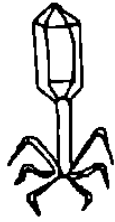
ঘ. উদ্দীপকের পরজীবী অমেবুদন্তী পোষক তথা মশকীর মধ্যে যেভাবে তার গ্যামিটোগনি দশা সম্পন্ন করে তার বিবরণ নিচে দেওয়া হলো—

মশকীর ক্রূপের অভ্যন্তরে গ্যামিট সৃষ্টির মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার জীবাণুর যৌন প্রজননকে গ্যামিটোগনি বলে। গ্যামিটোগনি ৩টি ধাপে ধাপে সম্পন্ন হয়। এর প্রথম ধাপ হলো গ্যামিট বা জননকোষ সৃষ্টি বা গ্যামিটোজেনেসিস। গ্যামিটোজেনেসিস দুই প্রকার। যথা— স্পার্মাটোজেনেসিস এবং উওজেনেসিস। স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ার প্রথমে মাইক্রোগ্যামিটোসাইটের নিউক্লিয়াসটি বিভক্ত হয়ে ৪-৮টি ক্ষুদ্রাকার নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এ সময় জীবাণু কয়েকটি কোণে বিশিষ্ট হয়। প্রতিটি কোণের মধ্যে একটি করে ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস প্রবেশ করে এবং নিউক্লিয়াসের চারদিকে সাইটোপ্লাজম জমা হয়। এর পরপরই জীবাণুর দেহটি মাইক্রোগ্যামিটে বা শূক্ৰাণুতে পরিণত হয়। আবার উওজেনেসিস প্রক্রিয়ার প্রথমে প্রতিটি মাইক্রোগ্যামিটোসাইট-এর নিউক্লিয়াস বিভক্ত হয়ে মাইক্রোগ্যামিটে বা ডিম্বাণুতে পরিণত হয়। গ্যামিটোগনির দ্বিতীয় ধাপ নিষেক ও জাইগোট সৃষ্টি। এ ধাপে মৃত্ত মাইক্রোগ্যামিটগুলো পৃথক পৃথকভাবে মাইক্রোগ্যামিটে বা ডিম্বাণুর দিকে অগ্রসর হয়। প্রতিটা ডিম্বাণুতে একটি করে শূক্ৰাণু প্রবেশ করে নিষেক সম্পন্ন হয়ে গোলাকার জাইগোট সৃষ্টি হয়। গ্যামিটোগনির শেষ ধাপ উওকিনেট গঠন। এ ধাপে গোলাকার নিচল জাইগোটটি সচল হয় এবং কিছুটা লম্বাকৃতি ধারণ করে উওকিনেটে পরিণত হয়। উওকিনেট এরপর মশকীর ক্রূপের প্রাচীর ভেদ করে প্রাচীরের বাইরের গায়ে সংলগ্ন হয় এবং সিস্ট আবরণ দ্বারা আবৃত হয়ে গোলাকার উওসিস্টে পরিণত হয়।

এভাবে ম্যালেরিয়ার পরজীবী মশকীর অভ্যন্তরে গ্যামিটোগনি দশা সম্পন্ন করে।



চিত্র-A



চিত্র-B

[গাবনা ক্যাডেট কলেজ]

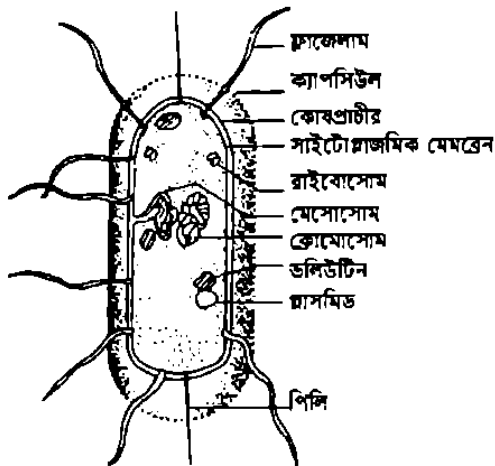
- ক. কনজুগেশন কী? ১
খ. ম্যালেরিয়া আক্রান্ত মানুষে কেন অ্যানিমিয়া দেখা যায়? ২
গ. উদ্ভীপকের চিত্র A-এর চিহ্নিত চিত্র আঁক। ৩
ঘ. উপরের 'A' অজ্ঞান ব্যবহার করে 'B' কীভাবে বংশবৃদ্ধি করে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে যৌন জনন পদ্ধতিতে পাশাপাশি দুটি কোষের মধ্যে কনজুগেশন টিউব তৈরি হয় এবং এই টিউবের মাধ্যমে পুংগ্যামিট স্ত্রীগ্যামিটের সাথে মিলিত হয় তাই কনজুগেশন।

খ. ম্যালেরিয়া আক্রান্ত মানুষে অ্যানিমিয়া বা রক্তস্বল্পতা দেখা যায়, তার শরীরে লোহিত রক্তকণিকা কমে যাওয়ার কারণে। কোনো সুস্থ মানুষ রোগজীবাণুবাহী এনেফিলিস মশকী দ্বারা দংশিত হলে মশকীর লালার সাথে রোগ জীবাণুর স্পোরোজোয়েট তার দেহে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে ম্যালেরিয়ার অযৌন জনন প্রক্রিয়ার হেপাটিক সাইজোগনির পর এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি পর্যায়ে ম্যালেরিয়া জীবাণু লোহিত রক্তকণিকা আক্রমণ করে এবং সেখানে বংশবৃদ্ধি করে। লোহিত কণিকার অভ্যন্তরে মেটক্রিন্টোমেরোজোয়েট হিমোগ্লোবিনকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে লোহিত কণিকা ভেঙে মেরোজোয়েট বেরিয়ে আসে এবং পুনরায় লোহিত কণিকা আক্রমণ করে। এভাবে মানবদেহে লোহিত রক্তকণিকার ভাঙনের ফলে রক্তস্বল্পতা বা অ্যানিমিয়া দেখা যায়।

গ. উদ্ভীপকের উল্লিখিত চিত্র A-হলো একটি ব্যাকটেরিয়া। নিচে ব্যাকটেরিয়ার চিহ্নিত চিত্র অংকন করা হলো—



চিত্র : একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়াম কোষ

ঘ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত 'B' অজ্ঞান ভাইরাস বংশবৃদ্ধি করার জন্য অজ্ঞান 'A' অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়াকে ব্যবহার করে।

ভাইরাসের জীবীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হলো সজীব কোষের অভ্যন্তরে এরা বংশবৃদ্ধি করে। যেমন, T_2 ফায় ভাইরাস *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার অভ্যন্তরে বংশবৃদ্ধি করে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো—

সংক্রমণ পর্যায়: ব্যাকটেরিয়া কোষের সংস্পর্শে আসা হতে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে এটি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের গায়ে

লেগে যায়। লেগে থাকা স্থানের কোষ প্রাচীর ছিদ্র হয়ে যায় এবং ভাইরাস শুধুমাত্র তার জেনেটিক বস্তু (DNA) ব্যাকটেরিয়াম কোষে অন্তঃক্ষেপ দ্বারা প্রবেশ করিয়ে দেয়।

সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায়: ভাইরাস DNA ও প্রোটিন আবরণ গঠন এবং নতুন ভাইরাস গঠন পর্যন্ত এ পর্যায়ে বিস্তৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের এনজাইমকে সংগঠিত করে অনেক নতুন ভাইরাস DNA এবং সেই সাথে প্রোটিন আবরণ তৈরি করে। শেষ পর্যায়ে DNA ও প্রোটিন আবরণ মিলে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করে।

বিগলন পর্যায়: ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীর ছিদ্র করে নতুন ভাইরাসগুলোর বের হয়ে আসাকে বিগলন পর্যায় বলে

এভাবে মাত্র ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে ৩০০ নতুন ভাইরাস সৃষ্টি হতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, T_2 ফায় ভাইরাস সর্বদাই অন্যের সহায়তায় অর্থাৎ *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার সহায়তায় বংশবিস্তারে সক্ষম।

- প্রশ্ন ১৯ A → অকোষীয় জীব, নিউক্লিয়াস প্রোটিন দ্বারা আবৃত।
B → এককোষীয় জীব, নিউক্লিয়াস আদিকেন্দ্রিক
C → এমন জীব যা মানবদেহে অযৌন জনন এবং *Anopheles* মশকীতে যৌন জনন সম্পন্ন করে।

[জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ]

- ক. কলেরা রোগের জীবাণুর বৈজ্ঞানিক নাম লেখো। ১
খ. গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়া বলতে কী বোঝায়? ২
গ. B কোষকে ধ্বংস করে A-এর সংখ্যা বৃদ্ধি বর্ণনা করো। ৩
ঘ. কীভাবে C জীবটি মানবদেহের ফক্টে অযৌন জনন সম্পন্ন করে তা আলোচনা করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কলেরা রোগের জীবাণু হলো *Vibrio cholerae* নামক ব্যাকটেরিয়া।

খ. ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিন্যাসের জন্য একটি রজন পদ্ধতি রয়েছে যাকে গ্রাম রজন পদ্ধতি বলা হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া শিয়ার নিয়ে তাতে ক্রিস্টাল ভায়োলেট রং দেয়া হয়, এরপর আয়োডিন দেওয়া হয় এরপর এটি অ্যালকোহলে ধুয়ে স্যাক্রানিনের লাল রং এ কাউন্টার স্টেইন করা হয়। যে সব ব্যাকটেরিয়া ভায়োলেট রং ধরে রাখবে তাদেরকে বলা হয় গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়া।

গ. উদ্ভীপকে A হলো ভাইরাস এবং B হলো ব্যাকটেরিয়া। ব্যাকটেরিওফায় ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কোষকে ধ্বংস করে সংখ্যাবৃদ্ধি করে।

যে সকল ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে তাদের ব্যাকটেরিওফায় বলে। T_2 ব্যাকটেরিওফায় তাদের বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়াকে (*E. coli*) আক্রমণ করে এবং তাদের দেহাভ্যন্তরে সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে থাকে

ব্যাকটেরিওফায়ের সংখ্যাবৃদ্ধি অর্থাৎ বংশবৃদ্ধিপ্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাদের বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। T_2 ব্যাকটেরিওফায় তাদের বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রথমে *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীরের সঙ্গে সংযুক্ত হয় পরে এনজাইমের কার্যকারিতায় ব্যাকটেরিয়ামের প্রাচীরে ছিদ্র তৈরির মাধ্যমে ফায় DNA ব্যাকটেরিয়াম কোষে প্রবেশ করায়। ব্যাকটেরিয়াম কোষের অভ্যন্তরে অসংখ্য ফায় DNA এবং ফায় কোট প্রোটিন তৈরি হয়। ফায় কোট প্রোটিন পরবর্তীতে নতুন ফায়ের মাথা, লেজ, স্পর্শকতন্তু ও স্পাইক তৈরি করে। এরপর অপত্য ফায় DNA এবং অন্যান্য প্রোটিন অংশগুলো যুক্ত হয়ে অসংখ্য নতুন T_2 ফায় তৈরি হয় সবশেষে ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীর বিগলনের মাধ্যমে অপত্য T_2 ব্যাকটেরিওফায়গুলো বাইরে বের হয়ে আসে। এভাবে T_2 ফায় তার সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকে।

ঘ. উদ্ভীপকে C হলো ম্যালেরিয়া পরজীবী প্লাজমোডিয়াম যা মানবদেহে ম্যালেরিয়া জ্বর সৃষ্টি করে।

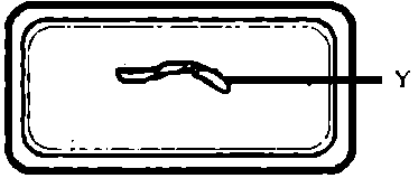
এ পরজীবীটি মানবদেহের যকৃতে হেপাটিক সাইজোগনি সম্পন্ন করে। মানবদেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুর স্পোরোজয়েট প্রবেশের পর প্রথম এক সপ্তাহে প্রি-এরিত্রোসাইটিক সাইজোগনি পর্যায়ের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। এতে স্পোরোজয়েট, ক্রিন্টোজয়েট, সাইজন্ট ও ক্রিন্টোমেরোজয়েট এ ধাপগুলো দেখা যায়।

স্পোরোজয়েটগুলো রক্তরস থেকে যকৃত কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং এখানেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যকৃত কোষ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে স্পোরোজয়েটগুলো গোলাকার ক্রিন্টোজয়েটে পরিণত হয়। প্রতিটি ক্রিন্টোজয়েট ক্রমাগত নিউক্লিয়াস বিভাজনের মাধ্যমে ধূ নিউক্লিয়াসযুক্ত সাইজন্ট দশায় উপনীত হয়। সাইজন্টের প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সাইটোপ্লাজম জমা হয়ে নতুন কোষের সৃষ্টি হয় যা ক্রিন্টোমেরোজয়েট নামে পরিচিত। পরিণত ক্রিন্টোমেরোজয়েটগুলো সাইজন্টের প্রাচীর বিদীর্ণ করে যকৃতের সাইনুসয়েডে আশ্রয় নেয়।

এভাবে ম্যালেরিয়া পরজীবী যকৃতে প্রি-এরিত্রোসাইটিক সাইজোগনি সম্পন্নের পর উৎপন্ন মেরোজয়েটগুলো নতুন যকৃত কোষকে আক্রমণের মাধ্যমে এক্সো-এরিত্রোসাইটিক সাইজোগনির সূচনা করে যা পরবর্তীতে সাইজন্ট দশায় পৌঁছায়। সাইজন্ট দশা থেকে পূর্বে বর্ণিত নিয়মেই বিভক্ত নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সাইটোপ্লাজম জমা হওয়ার মাধ্যমে নতুন কোষ সৃষ্টি হয় যাদেরকে মেটাক্রিন্টোমেরোজয়েট বলে। এগুলো আক্রান্ত যকৃত কোষ বিদীর্ণ করে বের হয়ে আসে।

এভাবেই ম্যালেরিয়া পরজীবী মানবদেহের যকৃতে জীবনকাল সম্পন্ন করে

প্রশ্ন ২০



চিত্র : X

[২০ নং প্রশ্নের উত্তর]

- ক. নিউক্লিওটাইড কী? ১
- খ. জেনেটিক কোড বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. 'Y' চিহ্নিত অংশটি কীভাবে এই অবস্থায় পরিণত হয়-ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. চিত্র-X এর Y চিহ্নিত অংশটির হোমোজেনাস অবস্থার গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. এক অণু নিউক্লিওটাইড এর সাথে এক অণু ফসফেট যুক্ত হয়ে গঠিত যৌগ হলো নিউক্লিওটাইড।

খ. জিন বা DNA হতেই বিভিন্ন প্রকার প্রোটিন সৃষ্টির নির্দেশ কয়েকটি বিশেষ সংকেতের মাধ্যমে mRNA দ্বারা পরিবেশিত হয়। এ সংকেতগুলোই জেনেটিক কোড। জেনেটিক কোড ত্রয়ী প্রকৃতির অর্থাৎ একটি অ্যামিনো অ্যাসিড নির্দেশকারী কোড বা সংকেত তিনটি নাইট্রোজেনাস বেস থাকে এবং এ কোড সার্বজনীন অর্থাৎ জীবের গঠন ও ধরনভেদে জেনেটিক কোডের পরিবর্তন ঘটে না।

গ. উদ্ভীপকের চিত্রটিতে 'Y' চিহ্নিত অংশ দ্বারা ব্যাকটেরিয়ার মেরোজাইগোট অবস্থা বুঝানো হয়েছে।

সাধারণত ঘোঁর জনন প্রক্রিয়ায় দুটি ব্যাকটেরিয়া কোষ একটি দাতা কোষ (+) এবং একটি গ্রহীতা কোষ (-) একত্রে এসে পাশাপাশি অবস্থান করে। পরে দুটি পাশাপাশি অবস্থিত কোষের মিলিত প্রাচীরের একস্থানে কোষপ্রাচীর বিগলিত হয়ে একটি সংযোগ নালী সৃষ্টি করে। এই নালী পথে দাতাকোষের ক্রোমোসোম গ্রহীতাকোষে প্রবেশ করতে থাকে। কিন্তু ক্রোমোসোমের আংশিক প্রবেশ করার পরই ব্যাকটেরিয়া দুটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় গ্রহীতাকোষ দাতাকোষের আংশিক ক্রোমোসোম নিয়ে যে জাইগোট তৈরি করে তাকে

বলা হয় মেরোজাইগোট। এ প্রক্রিয়ায় কোনো সংখ্যাবৃদ্ধি হয় না বরং দাতা কোষ আংশিক ক্রোমোসোম হারিয়ে অচিরেই নষ্ট হয়ে যায়, ফলে সংখ্যাবৃদ্ধির পরিবর্তে সংখ্যা হ্রাস পায়।

ঘ. উদ্ভীপকে প্রদত্ত চিত্র-X হলো হোমোজেনাস ব্যাকটেরিয়া। প্রকৃত ব্যাকটেরিয়া হলো হোমোজেনাস। এখানে হোমোজেনাস ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। নিচে তা আলোচনা করা হলো —

i. **ওষুধ শিল্পে :** ব্যাকটেরিয়া থেকে সাবটিলিন, পলিমিক্সিন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রস্তুত করা হয়। অ্যাকটিনোমাইসিসিস জাতীয় ব্যাকটেরিয়া থেকে আমরা স্ট্রেপটোমাইসিন, টেরামাইসিন ইত্যাদি অ্যান্টিবায়োটিক পেয়ে থাকি। আবার বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া থেকে ক্যেলরা, যক্ষ্মা, টাইফয়েড এবং ভিপথেরিয়া, ফুপিংকাশি, ধনুষ্টিংকার প্রভৃতি রোগের টিকা তৈরি হয়।

ii. **কৃষিক্ষেত্রে :** মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি; মৃত গাছপালা ও প্রাণিদেহ, গোবর কিংবা ময়লা আবর্জনার পচন, বিগলন ও পরিশেষে জৈব পদার্থ মাটির সাথে মিশিয়ে মাটিকে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ ও উর্বর করে তোলে।

iii. **নাইট্রোজেন সংবন্ধন** *Azotobacter*, *Clostridium*, *Pseudomonas* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া বাতাসের গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে সরাসরি পর্বণে পরিণত করে এবং মাটির উর্বরতা বাড়ায়। শিম জাতীয় গাছের মূলে *Rhizobium* নাইট্রেল সৃষ্টি করে সেখানে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে **ফলন বৃদ্ধি :** জমিতে কতিপয় ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করে ধান ও গমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

iv. **শিল্পক্ষেত্রে :**

- **দুগ্ধ শিল্পে** *Streptococcus lactis*, *Lactobacillus* জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার সহায়তায় দুধ থেকে দই, মাখন, পনির, ছোল, ছানা প্রভৃতি তৈরি করা হয়।
- **পাট শিল্পে :** *Clostridium* জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে পাট পঁচিয়ে সেখান থেকে আঁশ পৃথক করা হয়।
- **চামড়া শিল্পে :** ট্যানারিতে চামড়া থেকে লোম পৃথক করা এবং চামড়াকে নমনীয় করতে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়।
- **চা, কফি ও তামাক শিল্পে :** ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে চা, কফি, তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এর ফলে বিশেষ স্বাদ ও গন্ধের উৎপত্তি ঘটে।
- **রাসায়নিক শিল্পে** *Clostridium acetobutylicum* নামক ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে শর্করা হতে অ্যাসিটোন ও অ্যানকোহল তৈরি হয়। *Acetobacter xylinum* এর সাহায্যে অ্যানকোহল থেকে ভিনেগার এবং *Bacillus lacticacidi* দিয়ে ল্যাকটিক এসিড তৈরি হয়। বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া থেকে ভিটামিন B₁₂, B₁ এবং সেনুলেজ, প্রোটোয়েজ প্রভৃতি এনজাইম পাওয়া যায়। এমনকি রন্ধন শিল্পের টেন্ডিংসন্ট তৈরিতেও ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়।

প্রশ্ন ২১ সোহান বিশুদ্ধ পানি পান করে না। একদিন সে প্রাণ্ড ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলো এবং বমি করতে লাগলো। তার দেহে পানি শূন্যতা দেখা দিলো।

[২১ নং প্রশ্নের উত্তর]

- ক. ডেঙ্গু ভাইরাসের ভেক্টর কোনটি? ১
- খ. ফায় কী? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. সোহানের রোগটির চিকিৎসা বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. যে ধরনের অণুজীব সোহানের রোগটির কারণ সেগুলো শুধু ক্ষতিকারকই নয়, কিছু কিছু আমাদের জন্য অত্যন্ত উপকারী—বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ডেঙ্গু ভাইরাসের ভেক্টর হলো- *Aedes aegypti* নামক মশকী

২. ফায় একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ হলো ভক্ষণ করা। প্রকৃত অর্থে ফায় হলো ঐ সব ভাইরাস যারা জীবদেহে অবস্থিত রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে। T₂ ভাইরাস একটি ফায়। কারণ এরা E. coli ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে।

৩. সোহানের লক্ষণগুলো দেখে বোঝা যায় তার কলেরা হয়েছে। এটি পানিবাহিত একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগ হলে দূত চিকিৎসা গ্রহণ করা উচিত। কলেরার কার্যকর চিকিৎসা বেশ সহজ ও স্বল্পব্যয় সাপেক্ষ। চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেসব রোগী মুখে খাবার গ্রহণে সক্ষম তাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত খাবার স্যালাইন ঘনঘন পান করাতে হবে। এতে শরীরে পানির ঘাটতি দূর হয় এবং দূত রোগ নিরাময় ঘটে। যেসব রোগী মুখে খাবার গ্রহণ করতে পারে না তাদেরকে শিরার মধ্যে স্যালাইন দিতে হয়। তাছাড়া সংক্রমণ রোধ বা নিরাময়ের জন্য টেট্রাসাইক্লিন নামক এন্টিবায়োটিক দিতে হবে। বমি বন্ধের জন্য প্রোমেথাজিন থিয়োক্রেট জাতীয় ঔষধ দেওয়া যেতে পারে। এসব ঔষধ বা ব্যবস্থাগুলো অবশ্যই অভিজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমেই নিতে হবে। রোগীর অবস্থা বেশি খারাপ হলে দূত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

৪. সোহানের কলেরা রোগের জন্য দায়ী অণুজীব হলো *Vibrio cholerae* নামক গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া। তাই সোহানের রোগের জন্য দায়ী জীবাণুর ন্যায় অণুজীব বলতে এখানে ব্যাকটেরিয়াকে বোঝানো হয়েছে।

মানুষের অধিকাংশ মারাত্মক রোগ যেমন- যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতি রোগ ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে হয়ে থাকে। কিছু ব্যাকটেরিয়া খাদ্য দ্রব্য পচিয়ে বিষাক্ত করে তোলে। পানি দূষণ ও মাটির উর্বরতা বিনষ্টকরণও কিছু ব্যাকটেরিয়ার কারণে ঘটে থাকে। শুধু তাই নয় গমের টুটু রোগ, ধানের পাতা ধ্বংস, লেবুর ব্যাংকার, আলুর স্ক্যাব ইত্যাদি রোগসহ বিভিন্ন প্রাণির মারাত্মক রোগও এই ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে ঘটে থাকে, যা আমাদের আর্থিক ক্ষতি ঘটায়। তবে ক্ষতির পাশাপাশি ব্যাকটেরিয়ার উপকারী দিকও কম নয়। ব্যাকটেরিয়া থেকে বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিকসহ কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি মারাত্মক রোগের প্রতিষেধক টিকাও তৈরি করা হয়। কিছু ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন সংবন্ধনের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। এছাড়াও চা, কফি, তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ, পাট থেকে আঁশ এবং চামড়া থেকে লোম হাড়ানোয় ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় উক্ত অণুজীব অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া আমাদের শুধু ক্ষতি করেই না, উপকারও করে।

৫. শিক্ষক ছাত্রদের বললেন, কিছু অণুজীব আছে যেগুলো ভাইরাসের চেয়ে একটু বড় এবং সব জায়গায় পাওয়া যায়। তিনি আরও বললেন, এগুলোর ক্ষতিকর প্রভাবের পাশাপাশি পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক গুরুত্বও রয়েছে।

[বরিশাদ ক্যাডেট কলেজ/]

- ক. ইমার্জিং ভাইরাস কাকে বলে? ১
- খ. 'ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ২
- গ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত অণুজীবের শ্রেণিবিভাগ করো। ৩
- ঘ. উদ্ভীপকের শেষ লাইনটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যেসব ভাইরাস আদি পোষক থেকে নতুন পোষক প্রজাতিতে রোগ সৃষ্টি করে তাদেরকে ইমার্জিং ভাইরাস বলে।

খ. ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের মধ্যে পার্থক্য হলো—

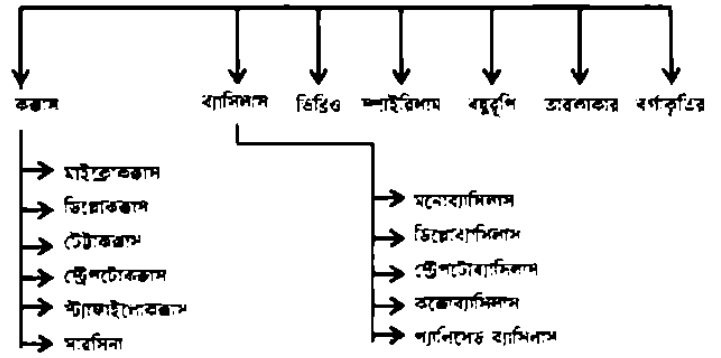
- ব্যাকটেরিয়ায় আদি প্রকৃতির নিউক্লিয়াস থাকে। অপরদিকে ভাইরাসে নিউক্লিয়াস থাকে না।

ব্যাকটেরিয়া সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু ভাইরাস তা পারে না।

- ব্যাকটেরিয়ায় বিপাক ক্রিয়া ঘটে। কিন্তু ভাইরাসে বিপাক ক্রিয়া ঘটে না।

৬. উদ্ভীপকে উল্লিখিত অণুজীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া। আকৃতি অনুসারে ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিভাগ নিচে দেওয়া হলো—

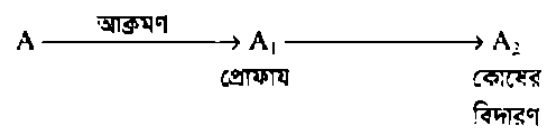
ব্যাকটেরিয়া



৭. উদ্ভীপকের শেষ লাইনে উল্লেখ করা হয়েছে "ব্যাকটেরিয়ার ক্ষতিকর প্রভাবের পাশাপাশি পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক গুরুত্বও রয়েছে।" বিভিন্ন ধরনের প্রাণরক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিক আমরা ব্যাকটেরিয়া থেকে পেয়ে থাকি। কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধকও ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি হয়ে থাকে। কিছু ব্যাকটেরিয়া বায়ুস্থ নাইট্রোজেন সংবন্ধনের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। দুধ থেকে পনির, দই, মাখন, ছানা ইত্যাদি তৈরিতেও ভূমিকা রাখে ব্যাকটেরিয়া। পাট থেকে আঁশ ছাড়াতে ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়া বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। চা, কফি ও তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যাকটেরিয়া নিঃসৃত এনজাইমের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া ব্যাকটেরিয়া অনেক সময় আমাদের ক্ষতিও করে থাকে। যেমন- মানুষের যক্ষ্মা, কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগ বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণেই হয়ে থাকে। ব্যাকটেরিয়ায় আক্রমণে অনেক সময় ফসলি উদ্ভিদে বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়ে থাকে। কিছু ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া মাটির উর্বরতা নষ্ট করে। ব্যাকটেরিয়ার কারণে অনেক সময় খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পানি দূষণের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায় ব্যাকটেরিয়া। উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ব্যাকটেরিয়ার কিছু ক্ষতিকর প্রভাব থাকলেও এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক।

৮. ১৩ A এবং B দুটি ভিন্ন ধরনের পরজীবী, যারা পোষক কোষের ক্ষতি সাধন করে, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

পোষক কোষকে



[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা/]

- ক. ক্যাপসিউল কি? ১
- খ. প্রমাণ কর "ব্যাকটেরিয়ার যৌন জনন একটি রিকম্বিনেশন প্রক্রিয়া।" ২
- গ. A₁ এবং A₂ পর্যায়ের সম্পর্কের ভিত্তিতে A পরজীবীর জীবনচক্র আলোচনা কর। ৩
- ঘ. উদ্ভীপকের B পরজীবীর B₁ হতে B₂ সৃষ্টির কৌশল উল্লেখপূর্বক রোগের লক্ষণ ও জ্বরের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পলিপেপটাইড বা পলিস্যাকারাইড দ্বারা গঠিত ব্যাকটেরিয়াম কোষের সর্ববাহিরের স্তরই হলো ক্যাপসিউল।

খ. ব্যাকটেরিয়ার যৌন জননে দুটি ব্যাকটেরিয়া কোষ পাশাপাশি অবস্থান করে। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি কোষের মিলিত প্রাচীরের একস্থানে কোষপ্রাচীর বিগলিত হয়ে যে সংযোগ নালী সৃষ্টি হয় তার ভেতর দিয়ে দাতাকোষের ক্রোমোসোম গ্রহীতা কোষে প্রবেশ করে। তবে ক্রোমোসোমের আংশিক প্রবেশ করার পরই ব্যাকটেরিয়া দুটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে ব্যাকটেরিয়ার যৌন জননে গ্রহীতা

কোষ ও দাতাকোষের আংশিক ক্রোমোসোম নিয়ে মেরোজাইগোট গঠিত হয়, যা দ্বি-বিভাজনের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায়। সুতরাং ব্যাকটেরিয়ার এই যৌন জনন প্রক্রিয়ায় কোনো সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না, বরং দাতাকোষ আংশিক ক্রোমোসোম হারিয়ে অচিরেই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে প্রথমে সংখ্যাবৃদ্ধির পরিবর্তে সংখ্যা হ্রাস পায়। কাজেই ব্যাকটেরিয়ার যৌন জনন একটি রিকম্বিনেশন প্রক্রিয়া।

গ উদ্দীপকে নির্দেশিত 'A' জীবাণুটি হলো T_2 ফায় ভাইরাস। T_2 ফায় ভাইরাস *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে (পোষক কোষ) গলায় লাইটিক চক্রের মাধ্যমে ধ্বংস করে।

উদ্দীপকে A_1 এবং A_2 পর্যায় দ্বারা মূলত লাইটিক চক্রকেই নির্দেশ করা হয়েছে। কাজেই T_2 ফায় ভাইরাসের জীবনচক্র লাইটিক চক্রের আলোকে নিম্নে আলোচনা করা হলো—

প্রোফায়/সংক্রমণ পর্যায়: ব্যাকটেরিয়া কোষের সংস্পর্শে আসা হতে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। সংস্পর্শক তত্ত্বের সাহায্যে এটি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের গায়ে লেগে যায়। লেগে থাকা স্থানের কোষপ্রাচীর ছিদ্র হয়ে যায় এবং ভাইরাস শুধুমাত্র তার জেনেটিক বস্তু (DNA) ব্যাকটেরিয়াম কোষে অন্তর্গত দ্বারা প্রবেশ করিয়ে দেয়।

সংখ্যা বৃদ্ধি পর্যায়: ভাইরাস DNA ও প্রোটিন আবরণ গঠন এবং নতুন ভাইরাস গঠন পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের এনজাইমকে সংগঠিত করে অনেক নতুন ভাইরাস DNA এবং সেই সাথে প্রোটিন আবরণ তৈরি করে। শেষ পর্যায়ে DNA ও প্রোটিন আবরণ মিলে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করে।

কোষের বিদারণ/বিগলন পর্যায়: ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীর ছিদ্র হয়ে নতুন ভাইরাসগুলো বের হয়ে আসে। এভাবে লাইটিক চক্রের মাধ্যমে T_2 ফায় ভাইরাসের জীবনচক্র সম্পন্ন হয়।

ঘ উদ্দীপকের 'B' পরজীবীটি হলো ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু। আর B_1 ও B_2 হলো ট্রফোজয়েট ও মেরোজয়েট দশা। ম্যালেরিয়া পরজীবীর এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি বা লোহিত কণিকায় সংঘটিত সাইজোগনিতে নিম্নোক্তভাবে ট্রফোজয়েট হতে মেরোজয়েট সৃষ্টি হয়— হেপাটিক সাইজোগনি সম্পন্ন হওয়ার পর সৃষ্টি মেরোজয়েটগুলো লোহিত রক্তকণিকার ভেতরে খাদ্যগ্রহণ করে ক্ষীত ও গুল হয়ে ট্রফোজয়েট (trophozoite)-এ পরিণত হয়। ট্রফোজয়েটের অভ্যন্তরে একটি গহ্বর সৃষ্টি হয়ে ক্রমশ তা বড় হয়ে সাইটোপ্লাজমকে পরিধির দিকে সরিয়ে দেয়, নিউক্লিয়াসও এক পাশে অবস্থান নেয়।

আট ঘণ্টার মধ্যে পরজীবীর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃস্থ গহ্বর অনুশ্য হয়ে যায়, ফলে পরজীবীকে অনিয়ত ও ক্ষণপদযুক্ত অ্যামিবার মতো দেখায়। পরজীবীর এ দশাকে অ্যামিবেয়েড ট্রফোজয়েট বলে। এ সময় লোহিত কণিকাটি আকারে বড় হয় এবং এর সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা দেখা যায়। অ্যামিবেয়েড ট্রফোজয়েট-এর ক্ষণপদ ক্রমে বিলীন হয়ে যায় এবং পরজীবীটি গোলাকার ধারণ করে। অতঃপর এর নিউক্লিয়াস অযৌন পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে ১২-২৪টি অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। এ রকম বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত পরজীবীকে সাইজন্ট বলে। পরিণত সাইজন্টে বহুবিভাজন ঘটে ১২-১৮টি গোল বা ডিম্বাকার সৃষ্টি হয়।

রোগের কারণ: *Plasmodium* গণের প্রায় ৬০টি প্রজাতি মানুষসহ বিভিন্ন মেবুদন্তী প্রাণীতে ম্যালেরিয়া নামক রোগটি সৃষ্টি করে।

লক্ষণ: ম্যালেরিয়া জ্বর-এর লক্ষণসমূহ নিম্নরূপ:

- প্রাথমিক পর্যায়ে মাথাধরা, বমি বমি ভাব, অনিদ্রা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।
- দ্বিতীয় পর্যায়ে রোগীর শীত অনুভূত হয় এবং কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। জ্বর 104° - 106° ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে। কয়েক ঘণ্টা পর জ্বর কমে যায়। ৪৮ ঘণ্টা পর পর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। *P. vivax* জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট ম্যালেরিয়ার প্রধান লক্ষণ।
- তৃতীয় পর্যায়ে রোগীর দেহে জীবাণুর সংখ্যা অসম্ভবভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণে দ্রুত রক্তের লোহিত কণিকা ভাঙতে থাকে, ফলে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। পীড়া ও মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে।

প্রশ্ন-২৪ সজিব তার প্রবাসি বন্ধু লিমনকে ই-মেইলে লিখে জানিয়েছে, “২০১৭ সাল, ঢাকা শহরে সবচেয়ে আলোচিত শব্দ ব্যাথা-চরম ব্যাথা। প্রায় প্রতি ঘরেই কেউ না কেই এ ব্যাথা রোগে আক্রান্ত। গিটে ব্যাথা, বসলে উঠতে পারে না, উঠলে হাটতে পারে না, ব্যথার পাশাপাশি জ্বরও অনেক। পেপার, পত্রিকা ও টিভি-তে একই আলোচনা, পরামর্শ ও সতর্কতা। বিশেষজ্ঞরা বার বার বলছে এ ধরনের রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম।

(বীরাঙ্গের নূর মোহাম্মদ দাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা)

- ক. সাইজন্ট কী? ১
- খ. ম্যালেরিয়া রোগে রক্ত শূন্যতা সৃষ্টি হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে সংশ্লিষ্ট জীবাণুর বৈশিষ্ট্য লেখ ৩
- ঘ. বিশেষজ্ঞদের মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট ম্যালেরিয়া পরজীবীর দশাই হলো সাইজন্ট।

খ ম্যালেরিয়া হলো *Anopheles* মশকীদ্বারা একধরনের মারাত্মক জ্বররোগ। মানুষসহ বিভিন্ন মেবুদন্তী প্রাণী এ রোগে আক্রান্ত হয়। মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় ম্যালেরিয়া এ পরজীবী বহুবিভাজন প্রক্রিয়ায় তার এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি সম্পন্ন করে এবং লোহিত রক্ত কণিকাকে ধ্বংস করে। এ রোগে লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংস হয় বলে রক্তশূন্যতা সৃষ্টি হয়।

গ উদ্দীপকে ‘চিকুনগুনিয়া’ রোগকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা একটি মশাবাহিত ভাইরাসজনিত রোগ। ভাইরাসের বৈশিষ্ট্যগুলোকে দু’ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: জড়-রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য এবং জীবীয় বৈশিষ্ট্য। জড়-রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

- ভাইরাস অকোষীয়, অতি আণুবীক্ষণিক ও সাইটোপ্লাজমবিহীন রাসায়নিক পদার্থ।
- পোষক দেহের বাইরে কোনো জৈবনিক কার্যকলাপ ঘটায় না।
- জীবকোষের বাইরে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে না।
- পরিমুত ও কেলাসিত করে ভাইরাসকে ক্ষয়টিকে পরিণত করা যায়।
- ভাইরাস আকারে বৃদ্ধি পায় না এবং পরিবেশিক উদ্দীপনায় সাড়া দেয় না।
- এনের নিজস্ব কোন বিপাকীয় এনজাইম নেই।
- ভাইরাস রাসায়নিকভাবে প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিডের সমাহার মাত্র।

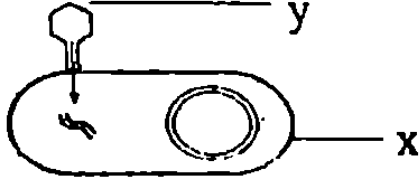
জীবীয় বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

- গাঠনিকভাবে ভাইরাসে নিউক্লিক এসিড (DNA বা RNA) আছে।
- উপযুক্ত পোষক কোষের অভ্যন্তরে ভাইরাস সংখ্যাবৃদ্ধি করতে সক্ষম।
- ভাইরাস সুনির্দিষ্টভাবে বাধ্যতামূলক পরজীবী।
- জিনগত পুনর্বিন্যাস ঘটতে দেখা যায়।
- ভাইরাসে প্রকরণ ও পরিব্যক্তি দেখা যায়।

ঘ উদ্দীপকে চিকুনগুনিয়া রোগকে নির্দেশ করা হয়েছে। এ রোগটি এডিস মশার সংক্রমণে হয়ে থাকে। তাই মশার কামড় থেকে সুরক্ষাই এ রোগ থেকে বাঁচার প্রধান উপায়। আর ব্যক্তি সচেতনায় এ রোগ প্রতিরোধের প্রধান উপায়। তাই এ রোগ প্রতিরোধের জন্য মশা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ঘূমানোর আগে মশারি টাঙ্গাতে হবে, সম্ভব হলে লম্বা হাতাযুক্ত জামা ও ট্রাউজার পরিধান করতে হবে, জানালায় নেট ব্যবহার করতে হবে, শরীরে মশা প্রতিরোধক ক্রিম ব্যবহার করতে হবে। এডিস মশা স্থির পানিতে ডিম পাড়ে। তাই বাগতি, ফুলের টব, গাড়ির টায়ার প্রভৃতি স্থানে যেন পানি জমতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এসব প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে এ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। তারপরও কোন ব্যক্তি যদি এ রোগে সংক্রমিত হয় তবে রোগীকে প্রচুর পরিমাণে পানি ও তরল জাতীয় খাবার খেতে দিতে হবে। অস্থিসন্ধির ব্যথার জন্য ঠান্ডা পানির সেক দিতে হবে এবং হালকা

ব্যায়াম করতে হবে এবং অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করতে হবে। তবে এই রোগের কার্যকরী অনুমোদিত কোনো টিকা নেই। সাধারণত বাহক এডিস মশা এইরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে কামড়ানোর পর অন্য কাউকে কামড়ালে এই ব্যক্তিও এ রোগে আক্রান্ত হবে। আর একারণেই প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই পারে এই রোগ থেকে কোনো ব্যক্তিকে সুরক্ষা দিতে। সুতরাং বিশেষজ্ঞদের "এ ধরনের রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম"— এই মন্তব্যটি সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

প্রশ্ন-২৫



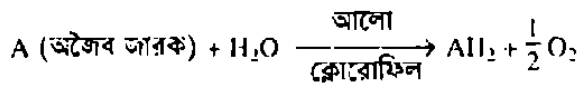
[কামগ্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

- ক. প্রস্বেদন কাকে বলে? ১
- খ. হিল বিক্রিয়া বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের চিত্রটিতে যে প্রক্রিয়াটি দেখানো হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- বৃষ্টি, শিল্প, পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় X এর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

কু যে শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের বায়বীয় অঙ্গ হতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বাষ্পকারে বের হয়ে যায় তাকে প্রস্বেদন বলে।

খু ইংরেজ প্রাণরসায়নবিদ রবিন হিল, যে বিক্রিয়ার মাধ্যমে CO_2 -এর অনুপস্থিতিতে ক্লোরোফিল, পানি ও কিছু অজৈব জারক একত্রে আলোতে রেখে প্রমাণ করেন, সালোকসংশ্লেষণে নির্গত O_2 -এর উৎস হলো পানি, সেই বিক্রিয়াটিই হলো হিল বিক্রিয়া। হিল বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ:



বিজ্ঞানী রবিন হিল-এর নামানুসারে এ বিক্রিয়াটির নামকরণ করা হয় হিল বিক্রিয়া।

গু উদ্দীপকের চিত্রটিতে ব্যাকটেরিওফায়ের সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায় দেখানো হয়েছে। নিচে ব্যাকটেরিওফায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করা হলো—

সংক্রমণ পর্যায়: ব্যাকটেরিয়া কোষের সংস্পর্শে আসা হতে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে এটি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের গায়ে লেগে যায়। লেগে থাকা স্থানের কোষ প্রাচীর ছিদ্র হয়ে যায় এবং ভাইরাস শুধুমাত্র তার জেনেটিক বস্তু (DNA) ব্যাকটেরিয়ামের গায়ে লেগে যায়। লেগে থাকা স্থানের কোষ প্রাচীর ছিদ্র হয়ে যায় এবং ভাইরাস শুধুমাত্র তার জেনেটিক বস্তু (DNA) ব্যাকটেরিয়াম কোষে অন্তঃক্ষেপ দ্বারা প্রবেশ করিয়ে দেয়।

সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায়: ভাইরাস DNA ও প্রোটিন আবরণ গঠন এবং নতুন ভাইরাস গঠন পর্যন্ত এ পর্যায়ে বিস্তৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের এনজাইমকে সংগঠিত করে অনেক নতুন ভাইরাস DNA এবং সেই সাথে প্রোটিন আবরণ তৈরি করে। শেষ পর্যায়ে DNA ও প্রোটিন আবরণ মিলে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করে।

নতুন ভাইরাস মুক্তি বা বিগলন পর্যায়: পোষক কোষের অভ্যন্তরে প্রচুর সংখ্যক ব্যাকটেরিওফায় তৈরি হওয়ার পর ফাট একটি সুনিশ্চিত এনজাইম তৈরি করে যার কার্যকারিতায় পোষক কোষের প্রাচীর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং নতুন সৃষ্ট ব্যাকটেরিওফায়গুলো মুক্তভাবে বেরিয়ে আসে।

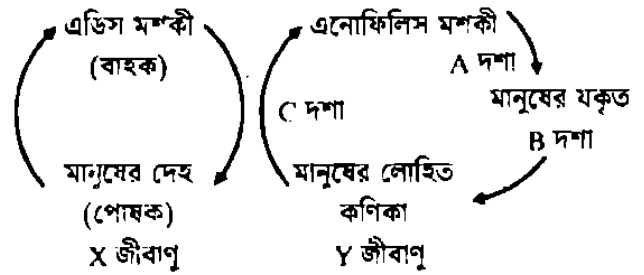
ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত X হলো ব্যাকটেরিয়া। কৃষি, শিল্প, পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া মাটির জৈব পদার্থ সঞ্চার করে উর্বরতা বৃদ্ধি করে। নানাবিধ আবর্তনা পচানোর মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া জৈব সার প্রস্তুত করে। কিছু ব্যাকটেরিয়া মাটিতে নাইট্রোজেন স্থাপন করে আবার কিছু ব্যাকটেরিয়া শিম জাতীয় উদ্ভিদের মূলের নডিউলে নাইট্রোজেন সংবন্ধনের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। কিছু ব্যাকটেরিয়া জমিতে ক্ষতিকর পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে আবার কিছু ব্যাকটেরিয়া ফসলের ফলন বৃদ্ধিতেও ব্যবহৃত হয়।

শিল্প ক্ষেত্রেও ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহার ব্যাপক। চা, কফি, তামাক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণে, দুগ্ধজাত শিল্পে, পাট শিল্পে, চামড়া তৈরি, ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি, অ্যাসিটোন তৈরি ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হয়।

মানুষের অস্ত্রের *E. coli* ও অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া ভিটামিন-বি, ভিটামিন-কে, ভিটামিন-বি_{১২}, ফোলিক অ্যাসিড, বায়োটিন প্রভৃতি পদার্থ প্রস্তুত ও সরবরাহ করে থাকে। জিন প্রকৌশলেও ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব অপরিমিত। এছাড়াও আবর্তনা পচনে, পয়ঃনিষ্কাশনে, পানিতে ভাসমান তেল অপসারণেও ব্যাকটেরিয়ার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন-২৬ নিচে জর সৃষ্টিকারী দুটি জীবাণুর জীবন চক্র দেখানো হল।



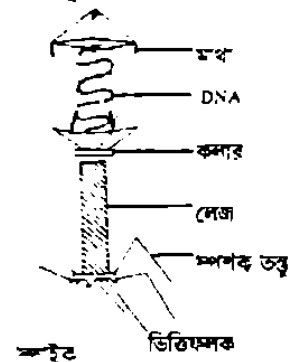
[হাদি ক্রস কলেজ, ঢাকা]

- ক. ক্যাপসোমিয়ার কী? ১
- খ. লাইটিক চক্র ঘটায় এমন একটি জীবাণুর চিহ্নিত চিত্র আঁক। ২
- গ. X জীবাণুর নিউক্লিক এসিডে বিদ্যমান কার্বোহাইড্রেটের গাঠনিক সংকেত আঁক। ৩
- ঘ. Y জীবাণুর ক্ষেত্রে A হতে B দশা এবং C দশা হতে A দশা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কী ধরনের পার্থক্য দেখা যায় উল্লেখ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভাইরাস ক্যাপসিডের প্রতিটি প্রোটিন অণুই হলো ক্যাপসোমিয়ার।

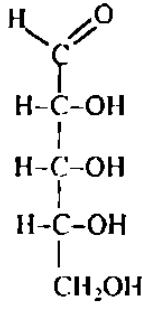
খ T_২ ব্যাকটেরিওফায় লাইটিক চক্র ঘটায়। T_২-ব্যাকটেরিওফায় জীবাণুটির চিহ্নিত চিত্র নিম্নরূপ—



চিত্র : T_২ ব্যাকটেরিওফায়

গ উদ্দীপকের 'X' জীবাণুটি হলো ডেজা ভাইরাস। এটি একটি RNA ভাইরাস RNA ভাইরাসটির নিউক্লিক এসিডে বিদ্যমান কার্বোহাইড্রেট

হলো রাইবোজ : রাইবোজের আণবিক সংকেত $C_5H_{10}O_5$ রাইবোজের গাঠনিক সংকেত নিম্নরূপ—



চিত্র : রাইবোজের গাঠনিক সংকেত

উদ্দীপকের Y জীবাণুটি হলো ম্যালেরিয়ার পরজীবী *Plasmodium*। জীবাণুটির ক্ষেত্রে A হতে B দশা দ্বারা হেপাটিক সাইজোগনি এবং C হতে A দশা দ্বারা স্পোরোগনিকে নির্দেশ করা হয়েছে। এদের মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়—

হেপাটিক সাইজোগনি	স্পোরোগনি
i. হেপাটিক সাইজোগনি মানুষের যকৃতে সংঘটিত হয়।	i. স্পোরোগনি মশারকের নেহে সংঘটিত হয়।
ii. এ পর্যায়ে মেরোজাইগোট তৈরি হয়।	ii. এ পর্যায়ে জাইগোট তৈরি হয়।
iii. এ পর্যায়ে মেটক্রিন্টোমেরোজয়েট, ম্যাক্রো-মেটক্রিন্টোমেরোজয়েট এবং ক্রিন্টোজয়েট সৃষ্টি হয়।	iii. এ পর্যায়ে স্পোরোজয়েট ও উওসিস্ট সৃষ্টি হয়।
iv. এ পর্যায়ে প্রতিটি ক্রিন্টোজয়েটের নিউক্লিয়াস ক্রমাগত বিভক্ত হয়ে কয়েকদিনের মধ্যে বহু নিউক্লিয়াস দশায় পরিণত হয়।	iv. এ পর্যায়ে ক্রমের গায়ে সংলগ্ন প্রতিটি উওসিস্টের নিউক্লিয়াস প্রথমে মায়োসিস ও পরে বারবার মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে বহু সংখ্যক হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়।
v. পরিণত ক্রিন্টোমেরোজয়েটগুলো নতুন যকৃতে কোষে প্রবেশ করে নিউক্লিয়াসের বার বার বিভাজনের মাধ্যমে বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট সাইজেন্ট দশায় পরিণত হয়।	v. উওসিস্ট প্রাচীরে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় জীবাণুর প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে প্রথমে সাইটোপ্লাজমে জমা হয় এবং পরে তার চারদিকে কোষ পর্দা দ্বারা গঠিত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষে পরিণত হয়।
vi. এ দশা সম্পন্ন হতে ২-৩ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হয়।	vi. এ দশা সম্পন্ন হতে ১০-১২ দিন প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন ২৭

X = নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন নির্মিত জড় পদার্থের ন্যায় অণুজীব।
Y = গবাদি পশুর অন্ত্রে বাস করে, সেলুলোজ হজমে সাহায্য করে।

(আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিবিল, ঢাকা)

- ক. ফিমব্রি কী? ১
খ. ম্যালেরিয়া পরজীবীদের নাম ও সুপ্তকাল লিখ। ২
গ. উদ্দীপক 'X' এর ব্যাজাচি আকৃতির গঠনটি লিখ। ৩
ঘ. উদ্দীপক 'Y' এর উপর 'X' এর বংশবৃদ্ধি নির্ভরশীল তা ব্যাখ্যা কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পিলিন নামক প্রোটিন নির্মিত ব্যাকটেরিয়ার বহির্গাত্রের খাটো সূত্রাকার উপজাই হলো ফিমব্রি।

খ. ম্যালেরিয়া পরজীবীদের নাম ও সুপ্তকাল :

ম্যালেরিয়া পরজীবী	সুপ্তকাল
i. <i>Plasmodium vivax</i>	১২-২০ দিন
ii. <i>Plasmodium falciparum</i>	৮-১৫ দিন
iii. <i>Plasmodium malariae</i>	১৮-৪০ দিন
iv. <i>Plasmodium ovale</i>	১১-১৬ দিন

গ. উদ্দীপকের 'X' হলো ভাইরাস এবং ব্যাজাচি আকৃতির ভাইরাসকে বলা হয় T_২-ব্যাকটেরিওফায়।

T_২-ফায় ভাইরাসের দেহকে দুটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়, যথা মাথা ও লেজ।

T_২-ফায় ভাইরাসের মাথাটি স্ফীত ও ষড়ভুজাকৃতির। এটি প্রোটিন অণু দিয়ে তৈরি। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৩-১০০ nm এবং প্রস্থ ৬৫ nm। থলির মতো এ স্ফীত অংশের ভেতরে রিং আকৃতির দ্বি-সূত্রক একটি DNA অণু পাঁচানো অবস্থায় থাকে। এই DNA তে ৬০,০০০ জোড়া নিউক্লিওটাইড থাকে। এতে জিন থাকে প্রায় ১৫০টি।

T_২-ফায়ের লেজের প্রধান অংশটি একটি ফোপা নলের মতো। লেজটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৫-১১০ nm এবং ব্যাস প্রায় ১৫-২৫ nm। লেজের উপরিভাগে সুস্পষ্ট চাকতির মতো একটি কলার আছে। লেজের অভ্যন্তরে কোনো DNA নেই। নিচের দিকে একটি বেসপ্লেট, কাঁটার মতো ৬টি স্পাইক ও ৬টি স্পর্শক তন্তু আছে। লেজ, কলার, বেসপ্লেট, স্পাইক এবং স্পর্শক তন্তু সবই প্রোটিন দ্বারা গঠিত।

T_২-ব্যাকটেরিওফায় ভাইরাসের দেহে কোনো নিউক্লিয়াস, কোষ প্রাচীর, অন্য কোনো ক্ষুদ্রাঙ্গ নেই।

উদ্দীপকের X-দ্বারা T_২ ব্যাকটেরিওফায় এবং Y দ্বারা *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে বোঝানো হয়েছে। T_২-ব্যাকটেরিওফায় এর বংশবৃদ্ধি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এরা Y অর্থাৎ *E. coli* এর উপর নির্ভরশীল।

T_২-ব্যাকটেরিওফায় তাদের বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রথমে *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। পরে এনজাইমের কার্যকারিতায় ব্যাকটেরিয়ার প্রাচীরে ছিদ্র তৈরির মাধ্যমে ফায় DNA ব্যাকটেরিয়াম কোষে প্রবেশ করায়। ব্যাকটেরিয়াম কোষের অভ্যন্তরে অসংখ্য ফায় DNA এবং ফায় কোট প্রোটিন তৈরি হয়। ফায় কোট প্রোটিন পরবর্তীতে নতুন ফায়ের মাথা, লেজ, স্পর্শকতন্তু ও স্পাইক তৈরি করে।

এরপর অপত্য ফায় DNA এবং অন্যান্য প্রোটিন অংশগুলো যুক্ত হয়ে অসংখ্য নতুন T_২ ফায় তৈরি হয়। সবশেষে *E. coli* কোষপ্রাচীর বিগলনের মাধ্যমে অপত্য T_২ ব্যাকটেরিওফায়গুলো বাইরে বের হয়ে আসে। এভাবে X তথা T_২ ফায় তার বংশবৃদ্ধি করে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, X-এর বংশবৃদ্ধি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের অভ্যন্তরেই ঘটে থাকে এবং Y এর অনুপস্থিতিতে X-এর বংশবৃদ্ধি সম্ভব নয়।

সুতরাং, সবশেষে বলা যায় Y-এর উপর X-এর বংশবৃদ্ধি নির্ভরশীল।

প্রশ্ন ২৮ ম্যালেরিয়া একটি জীবাণুবাহিত রোগ। মশার কামড়ে এটি এক মানুষ হতে অন্য মানুষে বিস্তার লাভ করে।

(শেখ বোরহানুদ্দীন পোষ্ট গ্রাজুয়েট কলেজ, ঢাকা)

- ক. ধানের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। ১
খ. সাইজোগনি কী? ২
গ. উদ্দীপকের ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনচক্রের যে অংশ মানুষের যকৃতে কোষে ঘটে তা লিখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকের রোগটির প্রতিকার লিখ। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ধানের বৈজ্ঞানিক নাম *Oryza sativa*।

খ. মানবদেহের যকৃতে এবং লোহিত কণিকায় সংঘটিত ম্যালেরিয়া জীবাণু *Plasmodium* এর অযৌন চক্র কে বলে সাইজোগনি। মানবদেহে ম্যালেরিয়া পরজীবী অযৌন জনন সম্পন্ন হয় যা মূলত দুটি পর্যায়ে বিভক্ত— একটি হেপাটিক সাইজোগনি যা মানবদেহের যকৃতে এবং অন্যটি এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি যা লোহিত রক্ত কণিকায় সংঘটিত হয়।

গ. উদ্দীপকের ম্যালেরিয়ার জীবাণু অর্থাৎ *Plasmodium* মানুষের যকৃতে কোষে হেপাটিক সাইজোগনি সম্পন্ন করে। হেপাটিক সাইজোগনিটি প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি ও এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি এ দু'ভাগে বিভক্ত।

মশকীর লালারসে এ পরজীবীর স্পোরোজয়েট দশা থাকে যা দংশনের মাধ্যমে মানুষের রক্তে প্রবেশ করে। মানবদেহে স্পোরোজয়েট প্রবেশের পর প্রথম এক সপ্তাহে প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি পর্যায়ের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। স্পোরোজয়েটগুলো রক্তরস থেকে যকৃতের প্যারেনকাইমা কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং এখানেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যকৃত কোষ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে স্পোরোজয়েটগুলো গোলাকার ক্রিন্টোজয়েটে পরিণত হয়। প্রতিটি ক্রিন্টোজয়েট ক্রমাগত নিউক্লিয়াস বিভাজনের মাধ্যমে বহুনিউক্লিয়াসযুক্ত সাইজন্ট দশায় উপনিত হয়। সাইজন্টের প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সাইটোপ্লাজম জমা হয়ে নতুন কোষের সৃষ্টি হয় যা ক্রিন্টোমেরোজয়েট নামে পরিচিত। পরিণত ক্রিন্টোমেরোজয়েটগুলো সাইজন্টের প্রাচীর বিদীর্ণ করে যকৃতের সাইনুসয়েডে আশ্রয় নেয়।

এভাবে ম্যালেরিয়া পরজীবী যকৃতে প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি সম্পন্ন হওয়ার পর উৎপন্ন মেরোজয়েটগুলো নতুন যকৃত কোষকে আক্রমণের মাধ্যমে এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনির সূচনা করে যা পরবর্তীতে সাইজন্ট দশায় পৌঁছায়। সাইজন্ট দশা থেকে পূর্বে বর্ণিত নিয়মেই বিভক্ত নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সাইটোপ্লাজম জমা হওয়ার মাধ্যমে নতুন কোষ সৃষ্টি হয় যাদেরকে মেটাক্রিন্টোমেরোজয়েট বলে। এগুলো আক্রান্ত যকৃত কোষ বিদীর্ণ করে বের হয়ে আসে।

এভাবেই ম্যালেরিয়া জীবাণু মানুষের যকৃতে হেপাটিক সাইজোগনি সম্পন্ন করে।

ঘ. উদ্দীপকের রোগটি হলো ম্যালেরিয়া। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ রোগ প্রতিকার করা যায়। ম্যালেরিয়া প্রতিকারের প্রধান তিনটি উপায় হচ্ছে— ক. মশকী নিধন, খ. মশকীর দংশনের হাত থেকে আত্মরক্ষা এবং গ. ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো—

ক. মশকী নিধন: মশককুলের বংশ ধ্বংস করা কঠিন কাজ। তবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে এদের বিস্তার রোধ করা সম্ভব।

জননক্ষেত্র নির্মূলকরণ: মশকী বন্ধ, পচা পাগিতে ডিম পাড়ে এবং সেখানে ডিম ফুটে লার্ভা ও পিউপা দশার বিকাশ ঘটে তাই মশা নিধনের জন্য জননক্ষেত্রগুলো বিনাশ করাই উত্তম। নিম্নোক্ত উপায়ে এ কাজ করা যায়। ডোবা, নালা ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় গর্ত মাটি দিয়ে ভরাট করা উচিত যাতে ঐসব স্থানে পানি জমতে না পারে। উন্মুক্ত নর্দমাগুলো ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করা এবং নর্দমাগুলো যাতে পানি বন্ধ না থাকে সে দিকে নজর দেওয়া। বাড়ির আশেপাশে ঝোপ-ঝাড় ও জঙ্গল কেটে ফেলা। লোকালয়ের আশেপাশে যাতে পানি আবদ্ধ হয়ে না থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া।

লার্ভা ও পিউপা ধ্বংস সাধন: যেসব জলাশয়ে মশকী ডিম পাড়ে সেখানে পানির উপর কেরোসিন বা পেট্রোল জাতীয় তেল ছিটিয়ে দিলে পানির উপর একটি পাতলা স্তর সৃষ্টি হয়। ফলে এ স্তর ভেদ করে মশকীর লার্ভাগুলোর পক্ষে বাতাস গ্রহণ করা সম্ভবপর না হওয়ায় তারা মারা পড়ে বিএইচসি, ডায়েলড্রিন ইত্যাদি কীটনাশক ওষুধ তেলের পানিতে ছিটিয়ে দিলে মশকীর লার্ভা ও পিউপা মারা যায়।

পূর্ণাঙ্গ মশকী নিধন: দংশন উদ্যত মশকী হাত দিয়ে মেরে ফেলা যায়। বিভিন্ন ফাঁদের সাহায্যে মশকী ধরা সম্ভব। সালফার ডাই-অক্সাইডের ধোয়া মশা তাড়াতে বা মেরে ফেলাতে সাহায্য করে। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ও বিকিরণ দিয়ে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে এদের বংশবিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

খ. মশকীর দংশনের হাত থেকে আত্মরক্ষা: শয়নকক্ষে মশারী ব্যবহার করতে হবে। দেহের অনাবৃত অংশে বিশেষ ক্রিম বা লোশন লাগাতে হবে। মশকী নিধন কয়েল জ্বালাতে হবে। ঘরের দরজা জানালায় ঘন তারের নেট লাগাতে হবে।

গ. ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা: ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত রোগীকে সর্বদা মশারীর মধ্যে রাখতে হবে। রোগীকে যেন কোনভাবেই মশা দংশন করতে না পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। কেননা মশকীর মাধ্যমে রোগীর দেহ থেকে এই রোগের পরজীবী অন্য সুস্থ ব্যক্তির দেহে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ক্লোরোকুইন, নিভাকুইন, ম্যাপাক্রিন, প্যালুড্রিন ইত্যাদি ম্যালেরিয়া পরজীবী ধ্বংসের ডাল ওষুধ।

প্রশ্ন ২৯ উদ্ভিদ বিজ্ঞান ক্লাসে জাহিদ স্যার পাঠানোর সময় বললেন, কিছু অকোষীয় অণুজীব আছে যা নিউক্লিক এসিড ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত। এরা ব্যাক্টেরিয়াকে আক্রমণ করে সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং ব্যাক্টেরিয়াকে ধ্বংস করে ফেলে। (সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা)

ক. গ্রাইকোক্যালিক্স কী? ১

খ. মায়োসিসকে হ্রাসমূলক বিভাজন বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অণুজীবের আকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রক্রিয়াটি চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. গ্রাইকোপ্রোটিন ও গ্রাইকোলিপিড এর সম্মিলিত রূপই গ্রাইকোক্যালিক্স।

খ. মায়োসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি প্রকৃতকোষ বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভক্ত হয়ে চারটি অপত্য কোষে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়ায় কোষের নিউক্লিয়াস দু'বার এবং ক্রোমোসোম একবার বিভাজিত হয়। ফলে অপত্য কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায়। ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেক হ্রাস পায় বলে এ বিভাজনকে হ্রাসমূলক বিভাজন বলা হয়।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অণুজীবটি হলো ভাইরাস। ভাইরাসের আকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস নিম্নরূপ—

i. দণ্ডাকার এদের আকার অনেকটা দণ্ডের মতো। উদাহরণ— টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (TMV), আলফা-আলফা মোজাইক ভাইরাস, মাম্পস ভাইরাস।

ii. গোলাকার এদের আকার অনেকটা গোলাকার, বর্তুলাকার ও বহুভুজাকার। উদাহরণ— পোলিও ভাইরাস, TIV, HIV, ডেঙ্গু ভাইরাস।

iii. ঘনক্ষেত্রাকার : এসব ভাইরাস দেখতে অনেকটা পাউরুটির মতো। যেমন— হার্পিস, ভ্যাকসিনিয়া ভাইরাস।

iv. ব্যাক্সাচি আকার এরা মাথা ও রেজ— এ দুই অংশে বিভক্ত। উদাহরণ— T₂, T₄, T₆ ইত্যাদি।

v. সিলিন্ড্রিক্যাল এদের আকার লম্বা সিলিন্ডারের মতো। যেমন— Ebola virus।

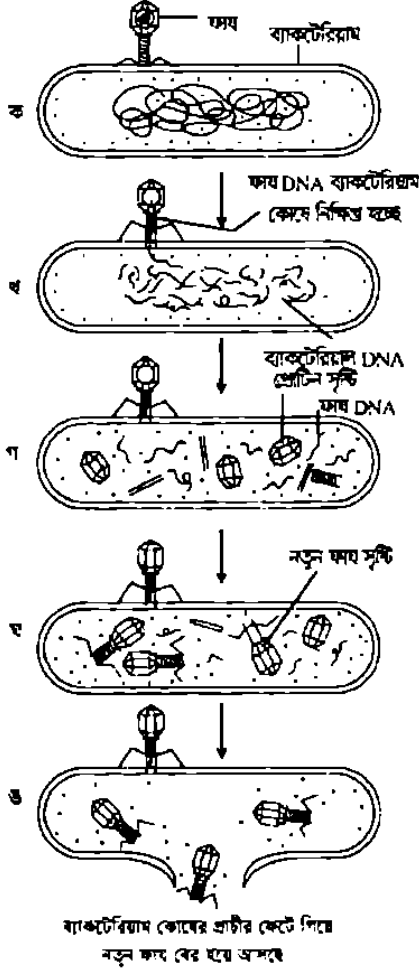
vi. ডিম্বাকার এরা অনেকটা ডিম্বাকার। উদাহরণ— ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অণুজীবটি হলো ভাইরাস। ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধির পদ্ধতিকে অনুলিপি বলা হয়। T₂ ফাফ ভাইরাসের ক্ষেত্রে সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়া কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়। নিচে সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হলো—

পৃষ্ঠলগ্ন হওয়া: T₂ ফাফ *Escherichia coli* ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের নির্দিষ্ট স্থানে স্পর্শকতন্তু এবং স্পাইকের সাহায্যে পৃষ্ঠলগ্ন হয়।

অনুপ্রবেশ: পৃষ্ঠলগ্ন হওয়ার পর স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে ভাইরাস তার দেহটিকে ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীরের যথাস্থানে আবদ্ধ করে এবং লাইসোজাইম এনজাইমের কার্যকারিতায় ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরে ছিদ্র সৃষ্টি করে। ফাজ লেজের প্রোটিন আবরণকে বাইরে রেখে শুধুমাত্র DNA কে ব্যাকটেরিয়ার কোষে প্রবেশ করায়।

সুপ্তকাল: অনুপ্রবেশের ১২-২২ মিনিট সময় পর্যন্ত ভাইরাসের DNA কে পোষক কোষে দেখা যায় না। এখানে ফায় DNA পোষক কোষের ক্রোমাটিন বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করে এবং পোষকের বংশগতীয় ক্রিয়াকলাপ নিজের নিয়ন্ত্রণে নেয়।



চিত্র: T₂ ফায়ের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়া

ফায়ের অঙ্ক উৎপাদন: কোষের কেন্দ্রাংশ বরাবর পলিমারেজ এনজাইমের সহায়তায় ব্যাকটেরিয়া কোষের নিউক্লিওটাইড ব্যবহার করে নতুন ফায় DNA-র অনুলিপি তৈরি হয়। নতুন ফায় DNA থেকে যে mRNA তৈরি হয় তা পোষক কোষের রাইবোজোমের ফ্যাক্টরিতে (ফায়ের জন্য) প্রোটিনের খোলস তৈরি করে থাকে।

নতুন T₂ ফায় সৃষ্টি: পোষক কোষের অভ্যন্তরে অপতা DNA ও প্রোটিন খোলস তৈরির পর এক কপি DNA অণু প্রোটিন খোলসে প্রবেশ করে। শেষে লাইসোজাইম এর সংশ্লেষ ঘটে এবং নতুন কার্যকর T₂ ফায় তৈরি হয়।

বিগলন বা লাইসিস: লাইসোজাইম এনজাইমের অনুরূপ কোনো পদার্থ পোষক কোষ হতে সৃষ্টি হওয়ার কারণেই পোষক কোষ প্রাচীরের মিউকোপ্রোটিন কমপ্লেক্স জাতীয় যৌগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে কোষ প্রাচীর বিদীর্ণ হয় এবং অপতা T₂ ফায় বাইরে নির্গত হয়।

৩৩ কৃষক জব্বার তার পেঁপে বাগানে গিয়ে লক্ষ্য করলো পেঁপেগুলোতে গাঢ় সবুজ বর্ণের গোলাকার দাগ পড়েছে। অপরদিকে ধানক্ষেতের অবস্থাও শোচনীয়। কারণ ধানের পাতা ও বোটায় লম্বা দাগের সৃষ্টি হয়েছে এবং দাগগুলো আস্তে আস্তে হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে। জব্বার মিয়া কৃষি কর্মকর্তার শরণাপন্ন হলে সে জানতে পারে পেঁপে গাছ ও ধান গাছ দুইটি ভিন্ন অণুজীব দ্বারা আক্রান্ত।

(সরকারি বিজ্ঞান কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা)

- ক. বায়োম কী? ১
- খ. লাইকেন কে বিশ্বজনীন উদ্ভিদ বলা হয় কেন? ২
- গ. জব্বার মিয়ার ফসল রক্ষায় কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? ৩
- ঘ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত অণুজীব দুইটির তুলনামূলক চরিত্র নিবরণ কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. একই ধরনের জলবায়ু, একই ধরনের মাটি, একই জাতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গঠিত একটি বৃহৎ ও পৃথকযোগ্য ইকোসিস্টেমই হলো বায়োম।

খ. লাইকেন এক বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ যা ছত্রাক এবং এককোষী শৈবাল বা সায়ানো-ব্যাকটেরিয়ার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহবস্থানে সৃষ্টি। গাছের বাকল, পাতা, ক্ষয়প্রাপ্ত গুড়ি, দেয়াল, পাথর, পর্বতগাত্র ইত্যাদি বস্তুর উপর এরা জন্মায়। তুন্দ্রা অঞ্চল, মরু অঞ্চল, নীরস পর্বতগাত্রসহ যেকোনো প্রতিকূল অবস্থানে লাইকেন জন্মায় বলে একে বিশ্বজনীন উদ্ভিদ বলা হয়।

গ. জব্বার মিয়ার পেঁপে বাগানে পেঁপে রিংস্পট বা মোজাইক রোগ দেখা দিয়েছে। এ রোগ থেকে ফসল রক্ষায়—

জমিতে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেলে সাথে সাথেই রোগাক্রান্ত গাছ উঠিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। জাল দিয়ে পুরো জমি (পেঁপের গাছসহ) ঢেকে দিতে হবে যেন এফিড পতঙ্গ দ্বারা নতুন গাছ আক্রান্ত না হতে পারে। এফিড পতঙ্গ নিধনের জন্য পেস্টিসাইড স্প্রে করা যেতে পারে। চারা লাগানোর প্রথম থেকেই নিয়মিত পেস্টিসাইড স্প্রে করলে এফিড পতঙ্গ দ্বারা রোগ ছড়ায় না। রোগাক্রান্ত জমিতে পেঁপে গাছের পুনিং (পাতা কাটা, ছাঁটা ইত্যাদি) বন্ধ রাখতে হবে, কারণ কাটা-ছেড়া স্থান দিয়ে রোগাক্রমণ ঘটে থাকে। জব্বার মিয়ার ধান ক্ষেতে ধানের লিফ ব্রাইট রোগ হয়েছে। এক্ষেত্রে ফসল রক্ষায়—

রোগ প্রতিরোধক জাত ব্যবহারে সাশ্রয়ী ও নিশ্চিত রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। মালা, বিপ্লব, আশা, ব্রি-২৯ জাত অপেক্ষাকৃত প্রতিরোধী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছত্রাকনাশকের সাথে স্ট্রেন্টোমাইসিন (250 ppm) মিশিয়ে স্প্রে করে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বীজ বপনের আগে ০.১% সিরিসান দ্রবণে ৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে বীজ বাহিত সংক্রমণ রোধ হয়। এছাড়া ব্রিচিং পাউডার (১০০ mg/ml) এবং জিঙ্ক সালফেট (২%) দ্বারা বীজ শোধন করা যায়। পরিত্যক্ত খড়, আগাছা, আবর্জনা সরিয়ে ফেলতে হবে। পরিমিত নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করতে হবে।

ঘ. জব্বার মিয়ার পেঁপে বাগান আক্রমণকারী অণুজীব হলো ভাইরাস এবং ধানক্ষেতে আক্রমণকারী অণুজীব হলো ব্যাকটেরিয়া। উভয় অণুজীবই মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণী এবং উদ্ভিদের রোগ ছড়ায়। আবার এদের নানারকম উপকারী ভূমিকাও রয়েছে। এদের মধ্যে বেশকিছু চরিত্রগত পার্থক্য লক্ষণীয় যা নিম্নরূপ—

ভাইরাস	ব্যাকটেরিয়া
১. এরা আকোষীয়। এতে নিউক্লিয়াস নেই।	১. এরা কোষীয়। আদি আকৃতির নিউক্লিয়াস থাকে।
২. এরা অতি-আণুবীক্ষণিক, ০.০১ হতে ০.৩ মাইক্রোমিটার।	২. এরা আণুবীক্ষণিক, ০.২ হতে ৫০ মাইক্রোমিটার।
৩. সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।	৩. সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে।
৪. কেলাসিত করার পর সজীব কোষে প্রবেশ করলে পুনরায় জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে।	৪. কেলাসিত করলে আর জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে না।
৫. এতে সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ নেই, বিপাক ক্রিয়াও দেখা যায় না।	৫. এতে সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ আছে এবং বিপাক ক্রিয়া ঘটে।
৬. এদের দেহে কোনো এনজাইম থাকে না।	৬. এদের দেহে এনজাইম থাকে।
৭. ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিডের মধ্যে অবস্থান করে।	৭. ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিডের মধ্যে অবস্থান করে না।
৮. কোষে DNA বা RNA যে কোনো এক প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।	৮. কোষে DNA বা RNA উভয় প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।

প্রশ্ন ৩১ দাইয়ান ও রাইয়ান দুই বন্ধু, ছুটিতে রাঙামাটি বেড়াতে যায় এবং ফিরে এসে উভয়েই জ্বরে আক্রান্ত হয়। দাইয়ানের প্রচণ্ড জ্বরের সাথে ঘাড় ও মাংসপেশিতে ব্যথা ও গায়ে র্যাশ দেখা গেছে। কিন্তু রাইয়ানের মাথাব্যথা বমিবমি ডাবসহ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। রক্ত পরীক্ষায় জানা গেল উভয়ের জ্বরের কারণ আলাদা।

(ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা)

- ক. ইন্টারফেরন কী? ১
- খ. ব্যাকটেরিওফায় বলতে কী বোঝ? ২
- গ. রক্ত পরীক্ষায় কীভাবে নিশ্চিত হওয়া গেল উভয়ের জ্বরের কারণ আলাদা— ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. রাইয়ানের রোগের জীবাণুর যৌন প্রজনন প্রক্রিয়া আলোচনা কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মানুষের অধিকাংশ কোষ থেকে নির্গত এক প্রকার প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন হলো ইন্টারফেরন যা ভাইরাসের প্রাথমিক সংক্রমণ ও ক্যান্সার প্রতিরোধ করে থাকে।

খ. ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণকারী ভাইরাসই হলো ব্যাকটেরিওফায়। ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির জন্য জীবিত কোষের প্রয়োজন হয়। ব্যাকটেরিওফায় বংশবৃদ্ধির জন্য ব্যাকটেরিয়াকে জীবিত কোষ হিসেবে ব্যবহার করে। যেমন T_2 ফায় ভাইরাস *E.coli* ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে সংখ্যাবৃদ্ধি বা বংশবিস্তার করে।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুই বন্ধু দাইয়ান এবং রাইয়ান যথাক্রমে ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত। উদ্দীপকে রোগের লক্ষণ দেখে তা বোঝা যায়। কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার জন্য রক্ত পরীক্ষা করা হলে তার সত্যতা পাওয়া যায়।

দাইয়ানের রোগের জন্য দায়ী হলো ডেঙ্গু ভাইরাস যার বাহক *Aedes aegypti* নামক মশকী। মশকীর লালার সাথে জীবাণু মানবদেহে প্রবেশ করে। রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ডেঙ্গু ভাইরাসের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়। যেমন- সেরোলজি পরীক্ষার মাধ্যমে রক্তে IgM অ্যান্টিবডি উপস্থিতি কিংবা তীব্র সংক্রামিত রক্তে অ্যান্টিবডি পরিমাণ চার গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এ জ্বরে আক্রান্ত হলে রক্তে প্লাটিলেটের সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক নিচে নেমে আসে। এছাড়া রক্ত কণিকার কালচার করে ডেঙ্গু ভাইরাস সনাক্ত করা যায়। অপরদিকে *Plasmodium* নামক পরজীবী দ্বারা ম্যালেরিয়া রোগ হয়। অ্যানোফিলিস নামক মশকীর মাধ্যমে এরা মানবদেহে প্রবেশ করে। রক্ত পরীক্ষা করা হয় জিমসা রঞ্জনের মাধ্যমে। এর ফলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে জীবাণুর বিভিন্ন পর্যায়সহ লোহিত কণিকার ক্ষয়িক্ষু দশা দেখা যায়। এছাড়া ম্যালেরিয়া অ্যান্টিজেনের ইমুনোক্রোমাটোগ্রাফিক পরীক্ষায় জীবাণু শনাক্ত করা যায়। উপরোক্ত আলোচনা হতে এটা স্পষ্ট রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেই জানা যায় যে উভয়ের জ্বরের কারণ আলাদা।

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত রাইয়ানের রোগের জীবাণু হলো *Plasmodium* যা ম্যালেরিয়া রোগের জন্য দায়ী। মশকীর রূপে *Plasmodium* যৌনজনন বা গ্যামিটোগনি সম্পন্ন করে।

দংশনের মাধ্যমে অ্যানোফিলিস মশকী ম্যালেরিয়া পরজীবীবাহী ব্যক্তির দেহ থেকে পরজীবীর বিভিন্ন ধাপসহ রক্ত শোষণ করে। রূপের পাচক রসের ক্রিয়ায় গ্যামিটোসাইট ছাড়া পরজীবীর অন্য ধাপগুলো হজম হয়ে যায়। এক্সল্যুজেনেশন নামে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক মাইক্রোগ্যামিটোসাইট ৪-৮ টি মাইক্রোগ্যামিট বা পুংগ্যামিট সৃষ্টি করে। মাইক্রোগ্যামিট বা শুক্রাণুগুলো মাতৃকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার জন্য সঁতার কাটতে থাকে। অন্যদিকে ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইটে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এটি স্ফীত হয়ে ওঠে এবং পরিপক্বতা লাভের সময় নিউক্লিয়াসটি প্রান্তের দিক সরে যায়। প্রত্যেক ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট থেকে একটি ম্যাক্রোগ্যামিট বা স্ত্রী গ্যামিট (ডিম্বাণু) সৃষ্টি হয়। নিষেকের উদ্দেশ্যে মাইক্রোগ্যামিটকে গ্রহণ করার জন্য ম্যাক্রোগ্যামিটের প্রান্তসীমার একটি অংশ সামান্য ফুলে উঠে কোণ সৃষ্টি করে।

পরিণত প্রতিটি ম্যাক্রোগ্যামিটের চতুর্দিকে অনেক মাইক্রোগ্যামিট এসে ভিড় জমালেও একটি মাত্র মাইক্রোগ্যামিটই নিষেকের সুযোগ পায়। মাইক্রোগ্যামিট প্রথমে ম্যাক্রোগ্যামিটের কোন এর সংলগ্ন হয় এবং পরে ভেতরে প্রবেশ করে। উভয়ের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম একীভূত হলে নিষেক সম্পন্ন হয় এবং কোণটিও অদৃশ্য হয়ে যায়। নিষেকের ফলে ম্যাক্রোগ্যামিট জাইগোট এ পরিণত হয়।

এভাবেই জননকোষ সৃষ্টি ও নিষেক প্রক্রিয়ায় জাইগোট সৃষ্টির মাধ্যমে পরজীবীটি মশকীর রূপের ভেতরে যৌন চক্র সম্পন্ন করে।

প্রশ্ন ৩২ রীমা ও সীমা উভয়েই অণুজীব নিয়ে গবেষণা করছেন। রীমার গবেষণার বিষয়বস্তু হচ্ছে অকোষীয় রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব, সীমার আদিকোষীয় অণুজীব। রীমার পর্যবেক্ষণে জানা গেল তার অণুজীব সীমার অণুজীবকে ভক্ষণের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

(ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা)

- ক. বায়োম কী? ১
- খ. পুষ্প প্রতীক কাকে বলে? ২
- গ. রীমা ও সীমার ব্যবহৃত অণুজীব দুটির পার্থক্য কর। ৩
- ঘ. রীমার পর্যবেক্ষণটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. একই ধরনের জলবায়ু, মাটি এবং একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গঠিত একটি বৃহৎ ও পৃথকযোগ্য ইকোসিস্টেমই হলো বায়োম।

খ. যে রেখাচিত্রের সাহায্যে একটি পুষ্পের বিভিন্ন স্তবকের অংশগুলোর সংখ্যা, অবস্থান, বিন্যাস, সংযোগ, পুষ্পপত্র বিন্যাস, অমরাবিন্যাস, প্রতিসাম্যতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যাবলী দেখানো হয় তাকে পুষ্প প্রতীক বলে। পুষ্পপ্রতীক মোটামুটি দৃষ্টাকার দেখানো হয়।

গ. রীমার ব্যবহৃত অণুজীবটি হলো ভাইরাস এবং সীমার ব্যবহৃত অণুজীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া। নিচে এদের মধ্যে পার্থক্য দেয়া হলো —

ভাইরাস	ব্যাকটেরিয়া
i. এরা অকোষীয় এবং এতে নিউক্লিয়াস নেই।	i. এরা কোষীয় এবং এতে আদি প্রকৃতির নিউক্লিয়াস থাকে।
ii. এরা সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।	ii. সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধির করতে পারে।
iii. এতে সাইটোপ্লাজম বা অন্য কোনো ক্ষুদ্রাঙ্গ নেই।	iii. এতে সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ আছে।
iv. এদের দেহে কোনো এনজাইম থাকে না।	iv. এদের দেহকোষে এনজাইম থাকে।
v. ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিড এর মধ্যে অবস্থান করে।	v. ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিড এর মধ্যে অবস্থান করে না।
vi. এদের মধ্যে DNA বা RNA যেকোনো এক প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।	vi. এদের মধ্যে DNA বা RNA যেকোনো উভয় প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রীমার ব্যবহৃত অণুজীবটি হলো ভাইরাস। ভাইরাসের জীবীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হলো সজীব কোষের অভ্যন্তরে এরা বংশ বৃদ্ধি করে। যেমন, T_2 ফায় ভাইরাস *E.coli* ব্যাকটেরিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে। T_2 ফায়ের বংশ বিস্তার —

সংক্রমণ পর্যায় : ব্যাকটেরিয়া কোষের সংস্পর্শে আসা হতে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে এটি *E.coli* ব্যাকটেরিয়ামের গায়ে লেগে যায়। লেগে থাকা স্থানের কোষপ্রাচীর ছিদ্র হয়ে যায় এবং ভাইরাস শুধুমাত্র তার জেনেটিক বস্তু (DNA) ব্যাকটেরিয়াম কোষে অন্তঃক্ষেপ দ্বারা প্রবেশ করিয়ে দেয়।

সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায় : ভাইরাস DNA ও প্রোটিন আবরণ গঠন এবং নতুন ভাইরাস গঠন পর্যন্ত এ পর্যায়ে বিস্তৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভাইরাস

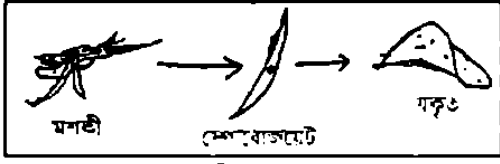
DNA ব্যাকটেরিয়ামের এনজাইমকে সংগঠিত করে অনেক নতুন ভাইরাস DNA এবং সেই সাথে প্রোটিন আবরণ তৈরি করে। শেষ পর্যায়ে DNA ও প্রোটিন আবরণ মিলে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করে।
বিগলন পর্যায় : ব্যাকটেরিয়ামের কোষপ্রাচীর ছিন্ন করে নতুন ভাইরাসগুলোর বের হয়ে আসাকে বিগলন পর্যায় বলে।
এভাবে মাত্র ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে ৩০০ নতুন ভাইরাস সৃষ্টি হতে পারে।

উপরের আলোচনা হতে বলা যায়, হীমার অণুজীবটি সীমার অণুজীবকে ডক্ষণের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্থাৎ বংশবিস্তার করে।

প্রশ্ন ৩৩



চিত্র-A



চিত্র-B

(হীমার পার্শ্ব ভাইরাস ল্যাবরেটরি ইনস্টিটিউট, ঢাকা)

- ক. ব্যাকটেরিওফায় কী? ১
- খ. ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার পার্থক্য লেখ। ২
- গ. উদ্ভীপকের চিত্র-A বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্ভীপকের চিত্র-B বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী ভাইরাস হলো ব্যাকটেরিওফায়

খ. ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

ভাইরাস	ব্যাকটেরিয়া
এরা অকোষীয়, অতি আণুবীক্ষণিক।	এরা কোষীয়, আণুবীক্ষণিক।
সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।	সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে।
এদের সাইটোপ্লাজম ও অন্যান্য ক্ষুদ্র অঙ্গাণু নেই।	এদের সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র অঙ্গাণু আছে।
এদের দেহে কোনো এনজাইম থাকে না।	এদের দেহে এনজাইম থাকে।

গ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত চিত্র A হলো T_২ ফায় T_২ ফায় ভাইরাসের ক্ষেত্রে বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়। নিচে বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হলো—

পৃষ্ঠলয় হওয়া: T_২ ফায় *Escherichia coli* ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের নির্দিষ্ট স্থানে স্পর্শকতন্তু এবং স্পাইকের সাহায্যে পৃষ্ঠলয় হয়।

অনুপ্রবেশ: পৃষ্ঠলয় হওয়ার পর স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে ভাইরাস তার দেহটিকে ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীরের ফাটলস্থানে আবদ্ধ করে এবং লাইসোজাইম এনজাইমের কার্যকরিতায় ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরে ছিদ্র সৃষ্টি করে। ফায় লেজের প্রোটিন আবরণকে বাইরে রেখে শুধুমাত্র DNA কে ব্যাকটেরিয়ার কোষে প্রবেশ করায়।

সূপ্তকাল: অনুপ্রবেশের ১২-২২ মিনিট সময় পর্যন্ত ভাইরাসের DNA কে পোষক কোষে দেখা যায় না। এখানে ফায় DNA পোষক কোষের ক্রোমাটিন বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করে এবং পোষকের বংশগতীয় ক্রিয়াকলাপ নিজের নিয়ন্ত্রণে নেয়।

ফায়ের অঙ্গা উৎপাদন: কোষের কেন্দ্রাংশ বরাবর পলিমারেজ এনজাইমের সহায়তায় ব্যাকটেরিয়া কোষের নিউক্লিওটাইড ব্যবহার করে নতুন ফায় DNA-র অনুলিপি তৈরি হয়। নতুন ফায় DNA থেকে যে mRNA তৈরি হয় তা পোষক কোষের রাইবোজোমীয় ফ্যাক্টরিতে (ফায়ের জন্য) প্রোটিনের খোলস তৈরি করে থাকে।

নতুন T_২ ফায় সৃষ্টি: পোষক কোষের অভ্যন্তরে অপত্য DNA ও প্রোটিন খোলস তৈরির পর এক কপি DNA অণু প্রোটিন খোলসে প্রবেশ করে। শেষে লাইসোজাইম এর সংশ্লেষ ঘটে এবং নতুন কার্যকর T_২ ফায় তৈরি হয়।

বিগলন বা লাইসিস: লাইসোজাইম এনজাইমের অনুরূপ কোনো পদার্থ পোষক কোষ হতে সৃষ্টি হওয়ার কারণেই পোষক কোষ প্রাচীরের মিউকোপ্রোটিন কমপ্লেক্স জাতীয় যৌগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে কোষ প্রাচীর বিনীর্ণ হয় এবং অপত্য T_২ ফায় বাইরে নির্গত হয়।

ঘ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত চিত্র-B দ্বারা ম্যালেরিয়া রোগের প্রি-এরিত্রোসাইটিক সাইজোগনি পর্যায় বুঝানো হয়েছে।

মানবদেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুর স্পোরোজোয়েট প্রবেশের পর প্রথম এক সপ্তাহে প্রি-এরিত্রোসাইটিক সাইজোগনি পর্যায়ের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। এতে স্পোরোজোয়েট, ক্রিন্টোজোয়েট, সাইজন্ট ও ক্রিন্টোমেরোজোয়েট এ ধাপগুলো দেখা যায়।

স্পোরোজোয়েটগুলো রক্তরস থেকে যকৃত কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং এখানেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যকৃত কোষ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে স্পোরোজোয়েটগুলো গোলাকার ক্রিন্টোজোয়েটে পরিণত হয়। প্রতিটি ক্রিন্টোজোয়েট ক্রমাগত নিউক্লিয়াস বিভাজনের মাধ্যমে বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত সাইজন্ট দশায় উপনীত হয়। সাইজন্টের প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সাইটোপ্লাজম জমা হয়ে নতুন কোষের সৃষ্টি হয় যা ক্রিন্টোমেরোজোয়েট নামে পরিচিত। পরিণত ক্রিন্টোমেরোজোয়েটগুলো সাইজন্টের প্রাচীর বিনীর্ণ করে যকৃতের সাইনুসয়েডে অগ্রসর নেয়।

এভাবে ম্যালেরিয়া পরজীবী যকৃতে প্রি-এরিত্রোসাইটিক সাইজোগনি সম্পন্ন হওয়ার পর উৎপন্ন মেরোজোয়েটগুলো নতুন যকৃতকোষকে আক্রমণের মাধ্যমে এক্সো-এরিত্রোসাইটিক সাইজোগনির সূচনা করে যা পরবর্তীতে সাইজন্ট দশায় পৌঁছায়। সাইজন্ট দশা থেকে পূর্বে বর্ণিত নিয়মেই বিভক্ত নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সাইটোপ্লাজম জমা হওয়ার মাধ্যমে নতুন কোষ সৃষ্টি হয় যাদেরকে মেটাক্রিন্টোমেরোজোয়েট বলে। এগুলো আক্রান্ত যকৃত কোষ বিনীর্ণ করে বের হয়ে আসে।

এভাবেই ম্যালেরিয়া পরজীবী মানবদেহের যকৃতে জীবনকাল সম্পন্ন করে।

প্রশ্ন ৩৪ নিচের উদ্ভীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

X = অকোষীয় অণুজীব যা ডেঙ্গু, এইডস প্রভৃতি রোগের জন্য দায়ী
Y = অকোষীয়, প্রাসমিড বহনকারী অণুজীব যা কলেরা, বম্বা রোগের জন্য দায়ী।
(উত্তর দাও স্থান এড কলেজ, ঢাকা)

- ক. মাধ্যমিক পোষক কাকে বলে? ১
- খ. লাইটিক চক্র ও লাইসোজেনিক চক্র এর মধ্যে পার্থক্য লিখ। ২
- গ. X কীভাবে Y কে ধ্বংস করে চিত্রসহ বর্ণনা দাও। ৩
- ঘ. কৃষিক্ষেত্রে, চিকিৎসাক্ষেত্রে ও শিল্পক্ষেত্রে Y এর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

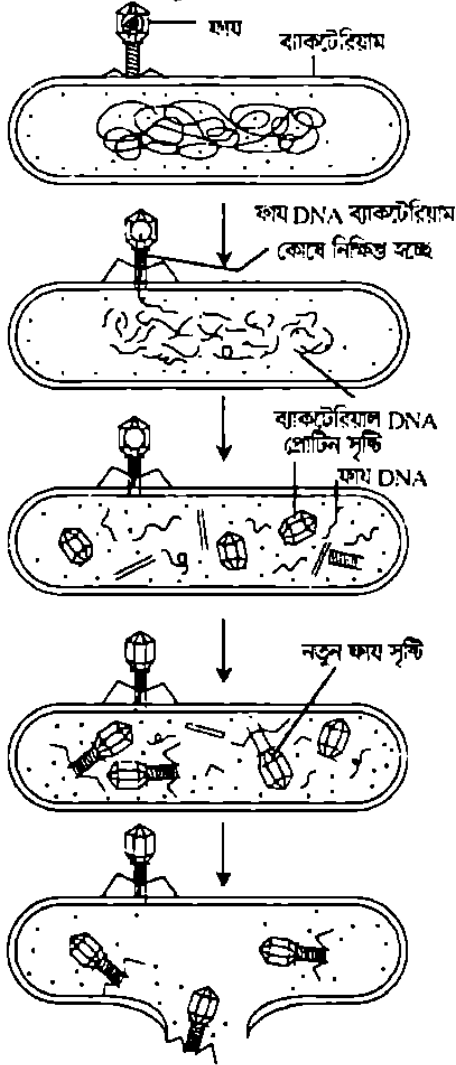
৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ম্যালেরিয়ার জীবাণু যে পোষকের দেহে (মানুষ) অযৌন জনন সম্পন্ন করে তাকে মাধ্যমিক পোষক বলে।

খ. লাইটিক চক্র ও লাইসোজেনিক চক্রের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

লাইটিক চক্র	লাইসোজেনিক চক্র
i. যে প্রক্রিয়ায় ফায় ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় ও ব্যাকটেরিয়া কোষের বিদারণ ঘটায় তাকে লাইটিক চক্র বলে।	i. এ চক্রে ফায় ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করার পর ভাইরাল DNA অণুটি ব্যাকটেরিয়ার DNA অণুর সাথে যুক্ত হয় এবং একত্রিত হয়ে প্রতিলিপি গঠন করে।
ii. পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসরূপে ব্যাকটেরিয়া হতে বিদারিত হয়।	ii. পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসরূপে ব্যাকটেরিয়া থেকে বিদারিত হয় না।
iii. এ চক্র একবার সম্পন্ন হলে অনেকগুলো ভাইরাসের সৃষ্টি হয়।	iii. এ চক্র একবার সম্পন্ন হলে মাত্র দুটি ভাইরাস জিনোমযুক্ত ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি হয়।
iv. এ চক্রে ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি ভাইরাস বহনকারী ব্যাকটেরিয়া হতে নিয়ন্ত্রিত হয়।	iv. এ চক্রে ভাইরাসের DNA এর সংখ্যাবৃদ্ধি পোষক ব্যাকটেরিয়া হতে নিয়ন্ত্রিত হয়।

গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত 'X' হলো ভাইরাস এবং 'Y' হলো ব্যাকটেরিয়া। T_2 ফায় ভাইরাস *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে একটি চক্রের মাধ্যমে ধ্বংস করে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়। এই চক্রকে লাইটিক চক্র বা বিগলনকারী চক্র বলে। চক্রটি নিম্নলিখিত ধাপসমূহে সংঘটিত হয়-



ব্যাকটেরিয়াম কোষের প্রাচীর ফেটে গিয়ে নতুন ফায় বের হয়ে আসছে।

চিত্র: লাইটিক চক্র

সংক্রমণ পর্যায়: ব্যাকটেরিয়া কোষের সংস্পর্শে আসা হতে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে এটি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের গায়ে লেগে যায়। লেগে থাকা স্থানের কোষ প্রাচীর ছিদ্র হয়ে যায় এবং ভাইরাস শুধুমাত্র তার জেনেটিক বস্তু (DNA) ব্যাকটেরিয়ায় কোষে অন্তঃক্ষেপ দ্বারা প্রবেশ করিয়ে দেয়।

সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায়: ভাইরাস DNA ও প্রোটিন আবরণ গঠন এবং নতুন ভাইরাস গঠন পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের এনজাইমকে সংগঠিত করে অনেক নতুন ভাইরাস DNA এবং সেই সাথে প্রোটিন আবরণ তৈরি করে। শেষ পর্যায়ের DNA ও প্রোটিন আবরণ মিলে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করে।

বিগলন পর্যায়: ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীর ছিদ্র করে নতুন ভাইরাসগুলোর বের হয়ে আসাকে বিগলন পর্যায় বলে।

এভাবে T_2 ফায় ভাইরাস *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে

ঘ. উদ্দীপকে 'Y' দ্বারা ব্যাকটেরিয়াকে নির্দেশ করা হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে, চিকিৎসাক্ষেত্রে ও শিল্পক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হলো-

কৃষিক্ষেত্রে ভূমিকা-

মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি: মৃত গাছপালা ও প্রাণিদেহ, পেশবর কিংবা ময়লা আবর্জনার পচন, বিগলন ও পরিশেষে জৈব পদার্থ মাটির সাথে মিশিয়ে মাটিকে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ ও উর্বর করে তোলে।

- নাইট্রোজেন সংবন্ধন: *Azotobacter*, *Clostridium*, *Pseudomonas* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া বাতাসের গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে সরাসরি লবণে পরিণত করে এবং মাটির উর্বরতা বাড়ায়। সিম জাতীয় গাছের মূলে *Rhizobium* নডিউল সৃষ্টি করে সেখানে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে।
- ফলন বৃদ্ধি: জমিতে কতিপয় ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করে ধানের উৎপাদন ৩১.৮% ও গমের উৎপাদন ২০.৮% বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে ভূমিকা -

- অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ তৈরিতে: ব্যাকটেরিয়া হতে সাবটিলিন, পলিমিক্সিন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রস্তুত করা হয়।
- প্রতিষেধক টিকা তৈরিতে: ব্যাকটেরিয়া হতে কলেরা টাইফয়েড, ফস্ফা প্রভৃতিরোগের প্রতিষেধক প্রস্তুত করা হয়। ডি.পি.টি, (ডিপথেরিয়া, ডুপিংকাশি ও ধনুন্টংকার) রোগের প্রতিষেধক ও ব্যাকটেরিয়া হতে প্রস্তুত করা হয়।

শিল্পক্ষেত্রে ভূমিকা-

- দুগ্ধ শিল্পে: *Streptococcus lactis*, *Lactobacillus* জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার সহায়তায় দুধ থেকে দই, মাখন, পনির, ঘোল, ছানা প্রভৃতি তৈরি করা হয়।
- পাট শিল্পে: *Clostridium* জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে পাট পচিয়ে সেখান থেকে আঁশ পৃথক করা হয়।
- চামড়া শিল্পে: টানারিতে চামড়া থেকে লোম পৃথক করা এবং চামড়াকে নমনীয় করতে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়।
- চা, কফি, তামাক শিল্পে: ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে চা, কফি, তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এর ফলে বিশেষ স্বাদ ও গন্ধের উৎপত্তি ঘটে।
- রসায়ন শিল্পে: *Clostridium acetobutylicum* নামক ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে শর্করা হতে আ্যসিটোন ও অ্যালকোহল তৈরি হয়। *Acetobacter xylium*-এর সাহায্যে অ্যালকোহল থেকে ভিনেগার এবং *Bacillus lacticacidi* দিয়ে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয়। এমনকি রন্ধন শিল্পের টেস্টিংসেন্ট তৈরিতেও ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়।

প্রশ্ন ৩৫ A-নিউক্লিক এসিড ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত অনুজীব যা অকোষীয়।

B- আদি কোষী অনুজীব যা এককোষী ও নিউক্লিয়াস-সুগঠিত নয়।

[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

- ভাস্কুলার বাস্কল কি? ১
- কাজের ভিত্তিক ভাজক টিস্যুর শ্রেণিবিভাগ কর? ২
- উদ্দীপকের অনুযায়ী A ও B এর মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৩
- A কিভাবে B এর মধ্যে বংশ বিস্তার করে?-ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. উদ্ভিদ দেহের অভ্যন্তরে জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যুর গুচ্ছই হলো ভাস্কুলার বাস্কল।

খ. কাজের ভিত্তিতে ভাজক টিস্যুকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (i) প্রোটোডার্ম; (ii) প্রোক্যাম্বিয়াম (iii) গ্রাউন্ড মেরিস্টেম।

প্রোটোডার্ম: যে ভাজক টিস্যুর কোষসমূহ উদ্ভিদদেহের ত্বক সৃষ্টি করে তাকে প্রোটোডার্ম বলে।

প্রোক্যাম্বিয়াম: ক্যাম্বিয়াম, জাইলেম ও ফ্লোয়েম সৃষ্টিকারী ভাজক টিস্যুকে প্রোক্যাম্বিয়াম বলে।

গ্রাউন্ড মেরিস্টেম: শীর্ষস্থ ভাজক টিস্যুর যে অংশ বারবার বিভাজিত হয়ে উদ্ভিদ দেহের মূল ভিত্তি তথা কটেক্স, মজ্জা ও মজ্জা রশ্মি সৃষ্টি করে তাকে গ্রাউন্ড মেরিস্টেম বলে।

গ. উদ্দীপক অনুযায়ী A হলো ভাইরাস এবং B হলো ব্যাকটেরিয়া নিচে এদের মধ্য পার্থক্য দেয়া হলো—

ভাইরাস	ব্যাকটেরিয়া
i. এরা অকোষীয় এবং এতে নিউক্লিয়াস নেই।	i. এরা কোষীয় এবং এতে আদি প্রকৃতির নিউক্লিয়াস থাকে।
ii. এরা সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।	ii. সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে।
iii. এতে সাইটোপ্লাজম বা অন্য কোনো ক্ষুদ্রাঙ্গ নেই।	iii. এতে সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ আছে।
iv. এদের দেহে কোনো এনজাইম থাকে না।	iv. এদের দেহকোষে এনজাইম থাকে।
v. ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিড এর মধ্যে অবস্থান করে।	v. ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিড এর মধ্যে অবস্থান করে না।
vi. এদের মধ্যে DNA বা RNA যেকোনো এক প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।	vi. এদের কোষে DNA ও RNA উভয় প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত A অনুজীবটি হলো ভাইরাস এবং B অণুজীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া। নিম্নে ব্যাকটেরিয়ার (*E. coli*) মধ্যে ভাইরাস (T ফায়) এর বংশ বিস্তার ব্যাখ্যা করা হলো—

সংক্রমণ পর্যায় : ব্যাকটেরিয়া কোষের সংস্পর্শে আসা হতে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে এটি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের গায়ে লেগে যায়। লেগে থাকা স্থানের কোষ প্রাচীর ছিদ্র হয়ে যায় এবং ভাইরাস শুধুমাত্র তার জেনেটিক বস্তু (DNA) ব্যাকটেরিয়াম কোষে অন্তঃক্ষেপ দ্বারা প্রবেশ করিয়ে দেয়।

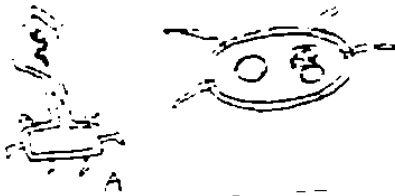
সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায়: ভাইরাস DNA ও প্রোটিন আবরণ গঠন এবং নতুন ভাইরাস গঠন পর্যন্ত এ পর্যায়ে বিস্তৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের এনজাইমকে সংগঠিত করে অনেক নতুন ভাইরাস DNA এবং সেই সাথে প্রোটিন আবরণ তৈরি করে। শেষ পর্যায়ের DNA ও প্রোটিন আবরণ মিলে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করে।

বিগলন পর্যায় : ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীর ছিন্ন করে নতুন ভাইরাসগুলোর বের হয়ে আসাকে বিগলন পর্যায় বলে।

এভাবে মাত্র ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে ৩০০ নতুন ভাইরাস সৃষ্টি হতে পারে।

উপরোক্ত ভাবে A তথা ভাইরাস B তথা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে বংশ বিস্তার করে।

প্রশ্ন ৩৬



/ক্যান্ডিডেট পারদর্শী ক্ষুদ্র ও প্রসঙ্গ: পারদর্শী, দিনাজপুর/

- ক. এন্ডেমিক জীব কী? ১
- খ. ইকোসিস্টেমে শক্তি প্রবাহ একমুখী ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. A অণুজীবটি কীভাবে B অণুজীবকে ধ্বংস করে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. B প্রাণীর অনুজীব ধানের এক ধরনের রোগ সৃষ্টি করে। রোগের নাম, লক্ষণ, দায়ী অনুজীবের নাম এবং প্রতিকার লিখ। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব জীবের স্বাভাবিক বিস্তৃতি নির্দিষ্ট প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলের বাইরে পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না সেসব জীবই হলো এন্ডেমিক জীব।

খ ইকোসিস্টেমের মধ্য দিয়ে শক্তির একমুখী চলনকে শক্তি প্রবাহ বলে। সূর্য থেকে যে গতিশক্তি ইকোসিস্টেমে প্রবেশ করে তার একটি অংশ উদ্ভিদ কর্তৃক সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় এবং ধূকোজের মতো বিভিন্ন জৈব অণুতে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে জমা হয়। কোষীয় শ্বসনের মাধ্যমে জৈব অণুগুলো ভেঙে শক্তি উৎপন্ন হয় যা শরীরে উত্তাপ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে খরচ হয় এবং শেষ পর্যন্ত নিম্নমানের শক্তি হিসেবে পরিবেশে ফিরে যায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে এ শক্তি শূন্যে চলে যায়। কাজেই বলা যায় শক্তি প্রবাহ একমুখী।

গ উদ্দীপকে নির্দেশিত 'A' অণুজীবটি হলো T_২ ফায় ভাইরাস এবং 'B' অণুজীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া। T_২ ফায় ভাইরাস লাইটিক চক্রের মাধ্যমে *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে এবং সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়। চক্রটি নিম্নলিখিত পর্যায়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়—

সংক্রমণ পর্যায় : ব্যাকটেরিয়া কোষের সংস্পর্শে আসা হতে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে এটি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের গায়ে লেগে যায়। লেগে থাকা স্থানের কোষ প্রাচীর ছিদ্র হয়ে যায় এবং ভাইরাস শুধুমাত্র তার জেনেটিক বস্তু (DNA) ব্যাকটেরিয়াম কোষে অন্তঃক্ষেপ দ্বারা প্রবেশ করিয়ে দেয়।

সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায় : ভাইরাস DNA ও প্রোটিন আবরণ গঠন এবং নতুন ভাইরাস গঠন পর্যন্ত এ পর্যায়ে বিস্তৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের এনজাইমকে সংগঠিত করে অনেক নতুন ভাইরাস DNA এবং সেই সাথে প্রোটিন আবরণ তৈরি করে। শেষ পর্যায়ের DNA ও প্রোটিন আবরণ মিলে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করে।

বিগলন পর্যায় : এই পর্যায়ে ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীর ছিন্ন করে নতুন ভাইরাসগুলো বের হয়ে আসে।

এভাবে T_২ ফায় ভাইরাস *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত 'B' অণুজীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া। ব্যাকটেরিয়া ধানের এক ধরনের বিশেষ রোগ সৃষ্টি করতে পারে। রোগটির নাম- ধানের লিফ ব্লাইট রোগ। এ রোগের জন্য দায়ী অণুজীব হলো- *Xanthomonas oryzae*

রোগটির লক্ষণ :

- i. পাতায় ডেড অর্ধমুখ লক্ষ্য নাগের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাতার শীর্ষে শুরু হয়।
- ii. নগ্ন ক্রমশ নৈর্দো ও প্রস্বেদ বড় হতে থাকে এবং ঢেউ খেলানো প্রাপ্ত বিশিষ্ট হয়।
- iii. দাগগুলো ক্রমশ হলুদ বা হলদে সাদা বর্ণের হয়।
- iv. সকালে দুধের মতো সাদা বা অর্ধমুখ রস আক্রান্ত স্থান থেকে ঝরে প্রবাহিত হয়। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন স্যাংক্রোফাইটিক ছত্রাকের আক্রমণে ক্ষত স্থান ধূসর বর্ণের হয়।
- v. আক্রমণ বেশি হলে পাতা দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং গাছটি মারা যায়।
- vi. ধানের ছড়া বন্ধ্যা হয়, ভাই ফলন ৬০% পর্যন্ত কম হতে পারে।
- vii. ধানের শীষে কোনো ফলন হয় না।

রোগটির প্রতিকার :

- i. বীজই রোগ জীবাণুর প্রধান বাহন। ব্রিচিং পাউডার (১০০mg/ml) এবং জিঙ্ক সালফেট (২%) দিয়ে বীজ শোধন করলে রোগাক্রমণ বহুলাংশে কমে যায়।
- ii. কপার যৌগ, অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ভালো সফল আনে না, কিছুটা উপকার হয়।
- iii. গাছ আক্রান্ত হলে ক্ষেতে হেক্টর প্রতি ২ কেজি ব্রিচিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে।
- iv. ফিনাইল সালফিউরিক অ্যাসিটেড এম. ক্লোরামফেনিকল ১০-২০ লিটার পরিমাণে মিশিয়ে আক্রান্ত ক্ষেতে ছিটালে রোগ নিয়ন্ত্রণ হয়।
- v. বীজ বপনের আগে ০.১% সিরিসান দ্রবণে ৮ ঘণ্টা ডিজিয়ে রাখলে বীজবাহিত সংক্রমণ রোধ হয়।

প্রশ্ন ৩৭ গ্রীষ্মের ছুটিতে মনিকা রাজ্জামাটি বেড়াতে গেল। ফেব্রার কয়েকদিন পরপর তার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। ডাক্তার কিছু পরীক্ষা করে দেখলেন তার শরীরে রক্ত স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। ডাক্তার আরো বললেন, এক কোষী প্রোটোজোয়া এ রোগের জন্য দায়ী।

(এম ই এইচ আরিক কলেজ, গাজীপুর)

- ক. ফায় কী? ১
- খ. ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ৪টি পার্থক্য লিখ। ২
- গ. উদ্ভীপকে অনুজীবটির মানুষের লোহিত রক্ত কনিকায় তার জীবন চক্রের যে ধাপগুলো উৎপন্ন করে তার সচিত্র বর্ণনা দাও। ৩
- ঘ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত অনুজীবটির জীবনে দুইটি পোষকের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সব ভাইরাস জীবদেহে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে তারাই ফায়।

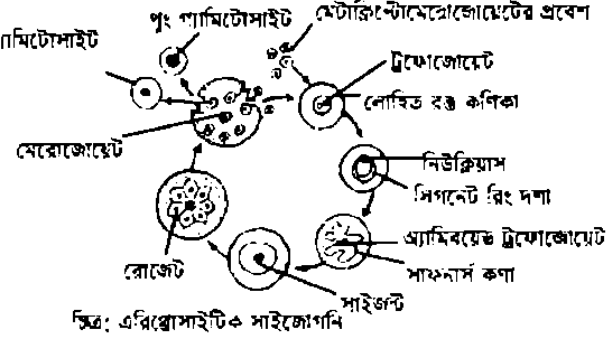
খ ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার চারটি পার্থক্য নিম্নরূপ :

ভাইরাস	ব্যাকটেরিয়া
এরা অকোষীয়, অতি আণুবীক্ষণিক।	এরা কোষীয়, আণুবীক্ষণিক।
সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।	সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে।
এদের সাইটোপ্লাজম ও অন্যান্য ক্ষুদ্র অঙ্গাণু নেই।	এদের সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র অঙ্গাণু আছে।
এদের দেহে কোনো এনজাইম থাকে না।	এদের দেহে এনজাইম থাকে।

গ উদ্ভীপকের অণুজীবটি মানুষের লোহিত রক্ত কণিকায় তার জীবন চক্রের এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি সম্পূর্ণ করে। নিচে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনির ধাপগুলোর সচিত্র বর্ণনা করা হলো:—

১. মাইক্রো-মেটাক্রিন্টোমেরোজয়েটগুলো যকৃত কোষ থেকে লোহিত রক্ত কণিকায় প্রবেশ করে এবং খাদ্য গ্রহণ করে স্ফীত ও গোলাকার হয়। এই দশাকে ট্রফোজয়েট দশা বলে। এ অবস্থায় জীবাণুর দেহে ক্ষুদ্র একটি কোষ গহ্বর ও ছোট একটি নিউক্লিয়াস দেখা যায়। এটি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী দশা।
২. কোষ গহ্বরটি ধীরে ধীরে বড় হয় ও নিউক্লিয়াসটি একপাশে সরে যায়, ফলে জীবাণুটি একটি আংটি আকৃতি লাভ করে। এই অবস্থাকে সিগনেট রিং বলা হয়। এ দশায় জীবাণু ক্ষণপদবিশিষ্ট *Amoeba* এর আকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাই এ দশাকে অ্যামিবিয়ড ট্রফোজয়েট বলে। এ সময় লোহিত কণিকাটি আকারে স্ফীত হয় এবং এর সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা দেখা যায়। এ গুলোতে সাফনার্স দানা (কণা) বলে। রক্ত কণিকায় সাফনার্স দানার উপস্থিতি দেখে ম্যালেরিয়া রোগ শনাক্ত করা হয়।
৪. অ্যামিবিয়ড ট্রফোজয়েট দশার কোষস্থ নিউক্লিয়াস বারবার বিভাজনের মাধ্যমে ১২-২৪টি অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট এ অবস্থাকে সাইজন্ট বলা হয়। এর সাইটোপ্লাজমে হিমোজয়েন নামক বর্জ্য পদার্থ জমা হয়।
৫. সাইজন্ট দশার প্রতিটি নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম ও প্লাজমামেমব্রেনসহ মেরোজয়েট—এ পরিণত হয়। মেরোজয়েটগুলো গোলাপের পাড়ির ন্যায় দুই স্তরে সজ্জিত হয়। এ দশাকে রোজেট বলে।
৬. পরবর্তী অবস্থায় লোহিত রক্ত কণিকা ভেঙে যায় এবং মেরোজয়েটগুলো প্লাজমায় বের হয়ে আসে। মেরোজয়েট রক্তস্রোতে ঢুকে গেলে রক্তের শ্বেত রক্ত কণিকাগুলো তাকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে। এসময় রক্তে প্রচুর পরিমাণে পাইরোজেন নামক রাসায়নিক পদার্থ জমা হয় এবং এর প্রভাবেই দেহে জ্বর আসে। সমগ্র চক্রটি সম্পন্ন হতে প্রায় ৪৮-৭২ ঘন্টা সময় লাগে।

৭. মুক্ত মেরোজয়েট নতুন লোহিত রক্ত কণিকাকে আক্রমণ করে এবং একইভাবে চক্রটি পুনরাবৃত্তি ঘটায়।
৮. কতিপয় মেরোজয়েট গ্যামিটোসাইটে পরিণত হয়। গ্যামিটোসাইট দুই প্রকার। পুং গ্যামিটোসাইট বা মাইক্রোগ্যামিটোসাইট এবং স্ত্রী গ্যামিটোসাইট বা ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট। পুং গ্যামিটোসাইটগুলো আকারে ছোট কিন্তু এর নিউক্লিয়াস বড় এবং স্ত্রী গ্যামিটোসাইটগুলো আকারে বড় কিন্তু এর নিউক্লিয়াস ছোট হয়। স্ত্রী ও পুং গ্যামিটোসাইটগুলো পোষক দেহের প্রাণীর রক্তনালীতে অবস্থান করে।



- ঘ** উদ্ভীপকের রোগের অণুজীবটি *Plasmodium vivax*। ম্যালেরিয়া রোগের এ জীবাণুটির জীবন চক্র সম্পন্ন করতে দুটি পোষকের প্রয়োজন। যথা— মানুষ ও মশকী। মশকীর দেহে অণুজীবটির যৌন এবং মানুষের দেহে অণুজীবটির অযৌন দশা সম্পন্ন হয়। এখানে মশকীর দেহে প্রথমে দু'প্রকার গ্যামিটোসাইট প্রবেশ করে এবং তারা মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে ডিম্বয়েড জাইগোট। জাইগোটটি শেষে মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে স্পোরোজয়েট উৎপন্ন করে। উৎপন্ন স্পোরোজয়েট পুনরায় মশকীর দেহে আক্রমণ না করে বরং মশকীর দংশনের মাধ্যমে মানুষের দেহে চলে আসে। এরপর স্পোরোজয়েট প্রথমে যকৃত কোষে ও পরে লোহিত রক্তকণিকায় আক্রমণ করে এবং সেখানে অযৌন জনন ঘটায়। তবে মানুষের দেহে পরজীবীটি শুধুমাত্র অযৌন চক্রের মাধ্যমে বারবার সাইজোগনি সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু যৌন চক্রের জন্য অবশ্যই মশকীর প্রয়োজন। সুতরাং আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, উদ্ভীপকের অণুজীবটির অর্থাৎ *Plasmodium vivax* এর জীবনচক্র সম্পন্ন করতে দুটি পোষকের প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন ৩৮ শিহাবের জ্বর। ডাক্তার তার রক্ত পরীক্ষা করে বললেন। এক ধরনের এককোষী জীবাণুর কারণে জ্বর এসেছে। এই জীবাণু মানুষের যকৃত কোষ ও লোহিত কণিকা ধ্বংস করে। সচেতন থাকলে এই জীবাণু থেকে দূরে থাকা সম্ভব।

(ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর)

- ক. ব্যাকটেরিওফায় কি? ১
- খ. ডেজু জ্বরের লক্ষণ লিখ ২
- গ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত জীবাণু দ্বারা মানুষের যকৃত কোষ ধ্বংসের কারণ ব্যাখ্যা কর ৩
- ঘ. উদ্ভীপকের শেষোক্ত লাইনটি ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী ভাইরাসই হলো ব্যাকটেরিওফায়।

খ ডেজুজ্বরের লক্ষণ—

- i. হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বর।
- ii. তীব্র মাথা ব্যথা ও চোখের পেছনে ব্যথা।
- iii. কোমর ও মাংসপেশিতে প্রচণ্ড ব্যথা।
- iv. অনেক সময় দাঁতের মাড়ি ও নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়।

গ উদ্ভীপকে উল্লিখিত জীবাণুটি হলো ম্যালেরিয়া জ্বরের বাহক *Plasmodium*। এই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে মানুষের যকৃত কোষ ধ্বংস হয়। নিচে মানুষের যকৃত কোষ ধ্বংসের কারণ ব্যাখ্যা করা হলো—

Plasmodium vivax পরজীবী আক্রান্ত *Anopheles* মশকীর দংশনের মাধ্যমে মানুষের দেহে এ পরজীবী প্রবেশ করে। মশকীর লালারসে এ পরজীবীর স্পোরোজোয়েট দশা থাকে যা দংশনের মাধ্যমে মানুষের রক্তে প্রবেশ করে। মানবদেহে স্পোরোজোয়েট প্রবেশের পর প্রথম এক সপ্তাহে প্রি-এরিস্থোসাইটিক সাইজোগনি পর্যায়ের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। স্পোরোজোয়েটগুলো রক্তরস থেকে যকৃতের প্যারেনকাইমা কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং এখানেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যা যকৃত কোষ ধ্বংসের অন্যতম কারণ। এছাড়াও যকৃত কোষ থেকে স্পোরোজোয়েটগুলো খাদ্য গ্রহণ করে গোলকাকার হয়, এটাও যকৃত কোষ ধ্বংসের কারণ। ম্যালেরিয়া পরজীবী যকৃতে প্রি-এরিস্থোসাইটিক সাইজোগনি সম্পূর্ণের পর আবারও উৎপন্ন মেরোজোয়েটগুলো নতুন যকৃত কোষকে আক্রমণ করে এবং হেপাটিক সাইজোগনি দশার শেষের দিকে আক্রান্ত যকৃত কোষ বিদীর্ণ হয়, যেটা মূলত যকৃত কোষ ধ্বংসের অন্যতম কারণ।

উদ্দীপকে বর্ণিত রোগটি হলো ম্যালেরিয়া জ্বর। স্ত্রী *Anopheles* মশকী এই রোগের জীবাণু বহন করে থাকে এবং এক রোগী থেকে অন্য সুস্থ দেহে সংক্রমণ ঘটিয়ে থাকে। এজন্য বলা যায়, মশকী নিধনই ম্যালেরিয়া জ্বর প্রতিরোধের একমাত্র উপায়। মশকী নিধনের জন্য মশকীর প্রজনন ক্ষেত্রগুলো ধ্বংস করা, প্রজনন ক্ষেত্রে নিয়মিত ঔষুধ ছিটানো, মশার লার্ভা ধ্বংস করা হয়। জলাশয়ে মশকীর লার্ভা ভক্ষণকারী গাঙ্গী, চেলা, খলিশা মাছ চাষ করা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়া ঘরে মশারী ব্যবহার, মশকী নিধনকারী রাসায়নিক স্প্রে করা, মশকীরোধী ক্রিম ব্যবহার করা উচিত। এছাড়া বাড়ির আশেপাশে প্রচুর পরিমাণে তুলসি গাছ লাগালে মশকীর উপদ্রব কম হয়। উপরিউক্ত সতর্কতাসমূহ মেনে চললে এ রোগ থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব।

প্রশ্ন ৩৯ রনির প্রচণ্ড জ্বর ও মাথা ব্যথা হলো। ৪৮ ঘন্টা পর পর তার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। অন্যদিকে সেতুর প্রচণ্ড জ্বরসহ শরীরে লালচে রঙের র্যাশ দেখা গেল। ডাক্তার দেখে বললেন, দুটি জ্বর দুটি পৃথক অণুজীব দ্বারা সৃষ্ট।

[সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম]

- ক. সিগনেট রিং কী? ১
- খ. হেপাটাইটিস বলতে কী বুঝ? ২
- গ. সেতুর জ্বরের জন্য দায়ী অণুজীবটির বংশবিস্তারে পোষকের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর ৩
- ঘ. রনির জ্বরের জন্য দায়ী অণুজীবটি যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্বর সৃষ্টি করে তা ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ম্যালেরিয়া পরজীবীর ট্রফোজোয়েটের নিউক্লিয়াস এক পাশে অবস্থান করায় আঙুরের মত যে আকৃতির সৃষ্টি হয় তাই সিগনেট রিং।

খ. সাধারণত লিভার প্রদাহকে হেপাটাইটিস বলা হয়। ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে লিভার প্রদাহ হলে তাকে ভাইরাল হেপাটাইটিস বলা হয়। এটি জন্মের অন্যতম প্রধান কারণ ১ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৩% এবং বাংলাদেশের প্রায় ৪০ লক্ষ লোক এ রোগে আক্রান্ত। ৮৫% ক্ষেত্রে এ ভাইরাস লিভারের স্থায়ী আক্রমণ গড়ে তোলে। অধিকাংশ হেপাটাইটিস হেপাটাইটিস-এ ভাইরাসের আক্রমণে হয়ে থাকে।

গ. উদ্দীপক অনুসারে, সেতুর প্রচণ্ড জ্বরসহ শরীরে লালচে রঙের র্যাশ দেখা গিয়েছে। সুতরাং, সেতু ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত। সেতুর জ্বরের জন্য দায়ী অণুজীবটির বংশবিস্তারে পোষকের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হলো—

ডেঙ্গু একটি ভাইরাস জনিত রোগ। এই ভাইরাসের জীবাণুর নাম ফ্লাভিভাইরাস। এটি একটি RNA ভাইরাস। এই ভাইরাসের বাহক হলো *Aedes aegypti* নামক মশকী, আর এর পোষক দেহ হলো মানুষ।

স্ত্রী মশকীর ডিম্বাণুর পরিষ্কৃটনের জন্য উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট প্রাণীর রক্ত প্রয়োজন। তাই কেবলমাত্র মশকীরই রক্ত পান করে এবং জীবাণুর বিস্তার ঘটায়। নিম্নশ্রেণির জীবেরা বার বার অযৌন পদ্ধতিতে বংশবিস্তারের কারণে তাদের জীবনীশক্তি হ্রাস পায়। তাই তারা মাঝে মাঝে যৌন জননে আবদ্ধ হয়ে জীবনীশক্তি পুনরুদ্ধার করে। এটি নিম্নশ্রেণির জীবদের Evolutionary অভিযোজন। ফ্লাভিভাইরাসের ক্ষেত্রে যৌন জনন *Aedes* মশকীতে এবং অযৌন জনন মানবদেহে ঘটে থাকে। এভাবে ফ্লাভিভাইরাস জীবনচক্র সম্পন্ন করে। শুধুমাত্র একটি পোষক দ্বারা জীবন চক্র সম্পন্ন করতে পারেনা।

সুতরাং, উপর্যুক্ত আলোচনা হতে জানা যায়, অণুজীবটির বংশ বিস্তারে পোষকের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

ঘ. রনি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত ধারণা করা হতো যে পরজীবীর দেহ থেকে নিঃসৃত হিমোজয়েন নামক বিষাক্ত রক্তক পদার্থের কারণে বা কোনো বিষবস্তু ক্ষরণের ফলে মানুষের দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং জ্বর আসে। কিন্তু বর্তমান ধারণা অনুযায়ী ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত মানুষের দেহের লোহিত রক্ত কণিকার প্রাচীর ভেঙে মেরোজোয়েটগুলো রক্তরসে প্রবেশ করে। মেরোজোয়েটগুলো বহিরাগত বস্তু যা রক্তের স্বাভাবিক পরিবেশ নয় করে দেয়। এ বহিরাগত বস্তুগুলোকে ধ্বংস করার জন্য রক্তের স্বেতকণিকা পাইরোজেন নামক এক প্রকার পদার্থ ক্ষরণ করে। স্বেতকণিকা যখন অতিরিক্ত পাইরোজেন ক্ষরণ করে তখন মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অংশ, বিশেষ করে তাপসংবেদী কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়। তখন প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, মনোঅ্যামাইন প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ বেড়িয়ে আসে। এ খবর হাইপোথ্যালামাসের পেছন দিকটায় পৌঁছালে ভেনোমোটর ন্যায়তত্ত্ব উত্তেজিত হয়। এ উত্তেজনা দেহের প্রান্তীয় অঙ্গুলের রক্তনালিগুলোকে সংকুচিত করে ফলে দেহ থেকে অতিরিক্ত তাপ বের হতে পারে না। এ কারণেই দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় অনেক বেড়ে যায়। দেহের এ তাপ বৃদ্ধিকে জ্বর বলে। ঠিক এ কারণেই রনির শরীরে জ্বর আসে।

প্রশ্ন ৪০ রনি ও মনি পরীক্ষা শেষে শহরে মামার বাড়িতে বেড়াতে গেলে সপ্তাহব্যাপী পর দেখা গেল রনির প্রচণ্ড জ্বরসহ শরীরে লালচে রঙের র্যাশ এবং মনির বমিসহ চালধোয়া পানির মত মল ত্যাগ করার লক্ষণ দেখা দিল।

[বরগুনা সরকারি মহিলা কলেজ]

- ক. জেনেটিক কোড কী? ১
- খ. সাইকাসের মূলকে কোরালয়েড মূল বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রনি ও মনির রোগের নাম উল্লেখসহ রোগ নিয়ন্ত্রণে ডাক্তারের পরামর্শগুলো লিখ। ৩
- ঘ. উভয়ের রোগ বিস্তারের ক্ষেত্রে পরিবেশীয় গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. নাইট্রোজেন বেসের যে গ্রুপ কোনো অ্যামিনো অ্যাসিডের সংকেত গঠন করে সেই গ্রুপই হলো জেনেটিক কোড।

খ. সাইকাস এর প্রধান মূল বিনষ্ট হওয়ার পর সেখান থেকে অস্থানিক মূল তৈরি হয় এবং তা ক্রমান্বয়ে দ্ব্যগ্র ও কতক সায়ানোব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। যার ফলে আক্রান্ত মূলগুলো স্বাভাবিক সবুজ না হয়ে সামুদ্রিক প্রবাল বা কোরালের মতো আকার ধারণ করে। এ কারণে সাইকাসের মূলকে কোরালয়েড মূল বলে।

গ. রনি ও মনির রোগ লক্ষণগুলো দেখে বোঝা যায় রনি ডেঙ্গু জ্বরে ভুগছে এবং মনি কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ডাক্তারের পরামর্শ:

- i. ডেঙ্গু মশা (*Aedes aegypti*) দিনের বেলায় কামড়ায়, তাই দিনের বেলায় ঘুমোনার সময় মশারি ব্যবহার করতে হবে।
- ii. ঘরে বা আশে পাশে কোনো পাত্রে বেশি দিন যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। কারণ সেখানে *Aedes* মশকী বংশ বিস্তার করতে পারে।

ডেজু জ্বরে আক্রান্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে যেতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে হবে।

জ্বর ও ব্যাথা কমানোর জন্য কেবলমাত্র প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষধ খাওয়া যেতে পারে, তবে অ্যাসপিরিন জাতীয় ঔষধ পরিহার করতে হবে।

কলেরা নিয়ন্ত্রণে ডাক্তারের পরামর্শ:

বিশুদ্ধ পানি বা ভালভাবে ফুটানো পানি পান করতে হবে।

পচা, বাসী বা খোলা খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

খাবার গ্রহণের পূর্বে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

কলোয় আক্রান্ত হলে দ্রুত রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা দিতে হবে।

রোগীকে বার বার খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

৭। উদ্দীপকের রনি ও মনির রোগ বিস্তারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ডেজু ও কলেরা রোগ বিস্তারের ক্ষেত্রে পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাড়ির আশপাশ অপরিষ্কার থাকলে সেখানে ডেজু মশার উপদ্রব বেড়ে যেতে পারে। আবার ঘরের ভেতর বা চারিপাশে কোনো পাত্রে অনেকদিন পানি জমে থাকলে সেখানে মশকী ডিম দিতে পারে, যা থেকে মশার বংশবৃদ্ধি ঘটে। এছাড়া ফ্রিজের তলদেশের বা এয়ারকুলারের নিচের এমনকি ফুলের টবের পানি অনেকদিন পরিষ্কার না করলে সেখানে ডেজু মশা তার বংশ বৃদ্ধি ঘটায়। ফলে ডেজু রোগের বিস্তার দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

আবার কলেরা রোগ সাধারণত পানির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। কলেরা রোগীর মল বা বমি নির্দিষ্ট স্থানে না ফেলে তা যদি পানির সঙ্গে মিশে যায় তবে সেখান থেকে রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করতে পারে। এছাড়া লোংরা পরিবেশে মাছির উপদ্রব বেড়ে গেলে এবং খাবার খোলা থাকলে সেখানে মাছি বসে ফলে তার মাধ্যমেও কলেরা রোগ ছড়াত পারে।

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ উভয় প্রকার রোগ বিস্তারে কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ৪১। গ্রুপ A : ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত, জলাতঙ্ক

গ্রুপ B : ম্যালেরিয়া

(বি এ এক শাখীন কলেজ, চট্টগ্রাম)

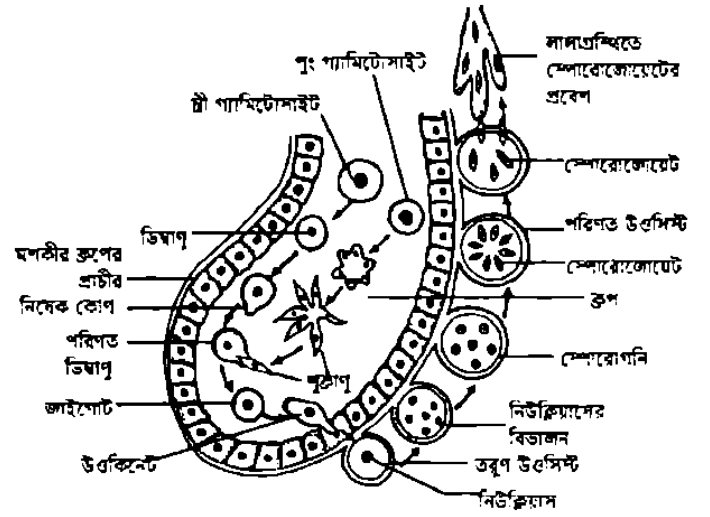
- ক. ভিরিয়ন কী? ১
- খ. জনক্রম কাকে বলে? ২
- গ. গ্রুপ 'B'-এর রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের যৌন জনন প্রক্রিয়ার চিত্রিত চিত্র আঁক। ৩
- ঘ. গ্রুপ-A-এর রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের শুধুমাত্র ক্ষতিকারক নয়, উপকারীও বটে—কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক। নিউক্লিক অ্যাসিড ও একে ঘিরে অবস্থিত ক্যাপসিড সমন্বয়ে গঠিত এক একটি সংক্রমনক্ষম সম্পূর্ণ ভাইরাস কণাই হলো ভিরিয়ন।

খ। কোনো জীবের জীবনচক্র সম্পন্ন করতে গ্যামিটোফাইটিক পর্যায়ে সাথে স্পোরোফাইটিক পর্যায়ে যে পালক্রম ঘটে তাকে জনক্রম বলে। উন্নত জীবের জনক্রমে গ্যামিটোফাইটিক পর্যায়ে পুং ও স্ত্রী গ্যামিট মিলিত হয়ে স্পোরোফাইটিক পর্যায়ে প্রথম কোষ জাইগোট সৃষ্টি করে।

গ। গ্রুপ-B এর রোগটি হলো ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব *Plasmodium*-এর যৌন জনন প্রক্রিয়ার চিত্রিত চিত্র অংকন করা হলো—



চিত্র : মশকীর দেহের ম্যালেরিয়া জীবগুণ জীবনচক্রের চিত্ররূপ

৭। গ্রুপ-A এর রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব হলো ভাইরাস। ভাইরাস উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করে থাকে। তাই এটি ক্ষতিকারক অণুজীব। তবে ভাইরাস তথা অণুজীবটি শুধু যে ক্ষতি করে তা নয় বিভিন্নভাবে উপকারও করে থাকে। যেমন—

বসন্ত, পোলিও, মলাং এবং জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক ভাইরাস থেকেই তৈরি হয়। ভাইরাস থেকে জন্মিত রোগের টিকা আবিষ্কার করা হয়েছে। জিন প্রকৌশল গবেষণায় বর্তমানে ভাইরাসকে বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া বেশ কিছু ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণেও ভাইরাস ব্যবহার করা হচ্ছে। ফায় ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে থাকে। ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ দমনেও ভাইরাসের ব্যবহার রয়েছে। শুধু তাই নয় টিউলিপ ফুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটানো হয়ে থাকে। সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় উদ্দীপকের গ্রুপ-B এর রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব অর্থাৎ ভাইরাস শুধুমাত্র ক্ষতিকারক নয়, উপকারীও বটে।

প্রশ্ন ৪২। A-একটি আদিকোষীয় অণুজীব যা মূলত এককোষী এবং ইহার নিউক্লিয়াস সুগঠিত নয়। এতে আবার একটি অতিরিক্ত বৃত্তাকার ডিএনএ আছে।

B-একটি বাধ্যতামূলক অকোষীয় পরজীবী যা জীবদেহে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে।

(পরীচ ওপুর সরকারি কলেজ)

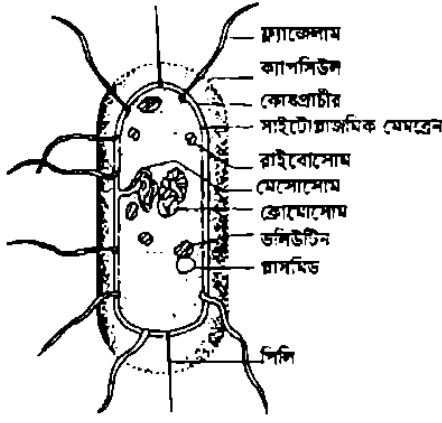
- ক. ভিরিয়ন কি? ১
- খ. ডেজু কেন মানুষের জন্য বিপদজনক? ২
- গ. A- অণুজীবের চিত্রিত চিত্র অংকন কর। ৩
- ঘ. B- কে কোন কোন ক্ষেত্রে কীভাবে মানব কল্যাণে ব্যবহার করা যায় বিশ্লেষণ কর। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক। নিউক্লিক অ্যাসিড ও একে ঘিরে অবস্থিত ক্যাপসিড সমন্বয়ে গঠিত এক একটি সংক্রমনক্ষম সম্পূর্ণ ভাইরাস কণাই হলো ভিরিয়ন।

খ। ডেজু একটি মশাবাহিত সংক্রামক রোগ। সাধারণ ডেজুজ্বর মানুষের জন্য ততটা বিপদজনক না হলেও হেমোরাজিক ডেজুজ্বর মানুষের জন্য বিপদজনক। সাধারণ ডেজুজ্বরের জটিলতা থেকে হেমোরাজিক ডেজুজ্বর দেখা যায়, ফলে এ অবস্থায় কয়েকদিন পর রোগীর নাক, মুখ, দাঁতের মাড়ি ও ত্বকের নিচে রক্তক্ষরণ দেখা যায়। রক্তে প্লাটিলেট ভীষণ কমে যায়। লসিকানালি ও রক্তনালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পায়খানার সাথে রক্ত যেতে পারে, রক্ত বমি হতে পারে, চোখে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে। পরবর্তীতে রক্তক্ষরণ বেড়ে গেলে রোগী শক এ চলে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে। একে ডেজু শক সিন্ড্রোম বলে। এ কারণে ডেজুজ্বর বিশেষত হেমোরাজিক ডেজুজ্বর মানুষের জন্য বিপদজনক।

১৩ উদ্ভীপকে উল্লিখিত 'A' বৈশিষ্ট্য দ্বারা ব্যাকটেরিয়াকে নির্দেশ করা হয়েছে। নিম্নে ব্যাকটেরিয়ার চিহ্নিত চিত্র অংকন করা হলো—



চিত্র : একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়াম কোষ

১৪ উদ্ভীপকে উল্লিখিত 'B' বৈশিষ্ট্য দ্বারা ভাইরাসকে নির্দেশ করা হয়েছে। মানব কল্যাণে ভাইরাসকে যেভাবে কাজে লাগানো যায় তা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

প্রতিষেধক তৈরিতে: বসন্ত, পোলিও, প্রেণ, টাইফয়েড, জন্মাত্তক প্রভৃতি রোগের টিকা বা ডাক্কিন তৈরিতে ভাইরাসের বাণিজ্যিক ব্যবহার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

জিনতত্ত্ব ও আণবিক জীববিদ্যায়: জিনতত্ত্বীয় এবং আণবিক জীববিদ্যা বিষয়ক বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষামূলক গবেষণায় ভাইরাস ব্যবহৃত হয়।

ব্যাকটেরিওফায হিসেবে: কিছু ভাইরাস মানুষের জন্য ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে আমাদের উপকার করে

ঔষুধ হিসেবে: টাইফয়েড, কলেরা, রক্ত আমাশয়, প্রেণ ইত্যাদি নামক ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগে কয়েকটি ফায ভাইরাস ঔষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পোকামাকড় দমনে: ভাইরাসকে কতিপয় ক্ষতিকারক ও বিপদজনক কীটপতঙ্গ দমনে ব্যবহার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে Nuclear Polyhydrosis Virus-কে পতঙ্গনাশক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়।

vi. বিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণে: জীব সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে ভাইরাস, কারণ ভাইরাসে একই সাথে জড় এবং জীবের বৈশিষ্ট্যাবলি রয়েছে।

vii. ফুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে: টিউলিপ ফুলের পাপড়িতে বিভিন্ন ছাপ মূলত ভাইরাসের আক্রমণ। ছাপযুক্ত টিউলিপ ফুল সৌন্দর্যের জন্য বিশ্বখ্যাত।

viii. জৈবিক নিয়ন্ত্রণ: বর্তমানকালে জৈবিক নিয়ন্ত্রণে ভাইরাসকে ব্যবহার করা হয়। অস্ট্রেলিয়ায় খরগোশ নিয়ন্ত্রণে মিক্সোভাইরাসকে ব্যবহার করা হয়।

৪৩ লুসাইবা গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়ে বাসায় আসার কিছুদিন পর তীব্র কাঁপুনিসহ জ্বর আসল। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কিছুক্ষণ পর প্রচুর ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়। রক্ত পরীক্ষায় দেখা গেল লুসাইবা রক্ত স্বল্পতায় ভুগছে।

(চট্টোপাধ্যায় সরকারি মহিলা কলেজ)

- ক. প্রজাতি কি? ১
- খ. বৈজ্ঞানিক নাম লিখ-সুন্দরী, করবী। ২
- গ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত জ্বরের অণুজীবটি লুসাইবার রক্তে যে ধাপটি সম্পন্ন করে তার চিহ্নিত চিত্র অংকন কর। ৩
- ঘ. অণুজীবটির জীবনে দুইটি পোষকের প্রয়োজন ব্যাখ্যা কর। ৪

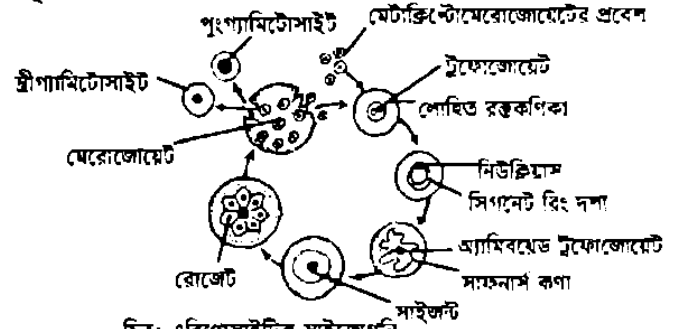
৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. প্রজাতি হলো সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যের মিল সম্পন্ন একদল জীব যাদের মধ্যে যৌন মিলনে উর্বর বংশধর উৎপন্ন হয়।

২। সুন্দরীর বৈজ্ঞানিক নাম— *Heritiera fomes*.

করবীর বৈজ্ঞানিক নাম— *Nerium odoratum*.

৩। উদ্ভীপকে উল্লিখিত রোগটি হলো ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণুর নাম *Plasmodium vivax*। এ পরজীবীটি লুসাইবার রক্তে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি সম্পন্ন করে। এ ধাপটির চিহ্নিত চিত্র নিম্নরূপ—



চিত্র: এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি

৪। উদ্ভীপকে উল্লিখিত লুসাইবার ম্যালেরিয়া রোগের জন্য দায়ী অণুজীবটি হলো *Plasmodium vivax*। অণুজীবটির জীবনচক্র সম্পন্ন করতে মানুষের দেহ এবং মশকী-এদুটি পোষকের প্রয়োজন। কারণ এ অণুজীবটির জীবনচক্রের যৌন দশাটি সম্পন্ন হয় মশকীর দেহে এবং অযৌন দশাটি সম্পন্ন হয় মানুষের দেহে। এখানে মশকীর দেহে প্রথমে দু'প্রকার গ্যামিটোসাইট প্রবেশ করে সেখানে তারা মিলিত হয়ে জাইগোট উৎপন্ন করে। জাইগোটটি শেষে মায়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে স্পোরোজোয়েট উৎপন্ন করে। উৎপন্ন স্পোরোজোয়েট পুনরায় মশকীর দেহে আক্রমণ করে না বরং মানুষের দেহে চলে আসে। এরপর স্পোরোজোয়েট প্রথমে যুক্ত কোষ ও পরে লোহিত রক্তকণিকা আক্রমণ করে এবং সেখানে অযৌন জনন ঘটায়। তবে মানুষের দেহে পরজীবী শুধুমাত্র অযৌন চক্রের মাধ্যমে বারবার সাইজোগনি সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু যৌন চক্রের জন্য অবশ্যই মশকী প্রয়োজন। সুতরাং আলোচনা থেকে সম্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, অণুজীবটির জীবনে দুইটি পোষকের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

৪৪ উচ্চতর গবেষণার জন্য দুই দল গবেষক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান গবেষণাগারে অণুজীব নিয়ে গবেষণার কাজ করছেন।

প্রথম দল: অকোষীয় রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব নিয়ে কাজ করছেন।

দ্বিতীয় দল: আদি কোষীয় অণুজীব নিয়ে কাজ করছেন। গবেষক দলের যৌথ ব্রিফিং জানা গেল প্রথম দলের অণুজীব দ্বিতীয় দলের অণুজীবকে ভক্ষণ করে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায়।

(লালমনিরহাট সরকারি কলেজ)

- ক. মেরিস্টেম কালচার কি? ১
- খ. ফটোফসফোরাইলেশন বলতে কি বুঝ? ২
- গ. প্রথম ও দ্বিতীয় গবেষকদল যে অণুজীব নিয়ে কাজ করছেন, সেই অণুজীবদ্বয়ের মধ্যে গঠনগত পার্থক্য লিখ। ৩
- ঘ. গবেষক দলের যৌথ ব্রিফিং এ যে বিষয়টি জানা গেল সে প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ কর ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মেরিস্টেম কালচার হলো টিস্যুকালচার পদ্ধতির একটি বিশেষ দিক যার মাধ্যমে রোগমুক্ত চারাগাছ উৎপাদন করা যায়।

খ. কোনো যৌগের সাথে ফসফেট সংযুক্তি প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফসফোরাইলেশন। আর আলোক শক্তি ব্যবহার করে ফসফোরাইলেশন ঘটানোকে বলা হয় ফটোফসফোরাইলেশন। অর্থাৎ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলোক শক্তি ব্যবহার করে ATP তৈরি করার প্রক্রিয়াকে ফটোফসফোরাইলেশন বলে।

গ. উদ্ভীপকের প্রথম ও দ্বিতীয় গবেষকদল যথাক্রমে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া নামক অণুজীব নিয়ে কাজ করছেন। ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে গঠনগত পার্থক্য নিম্নরূপ—

ডাইরাস	ব্যাকটেরিয়া
i. ডাইরাস অকোষীয়। এতে নিউক্লিয়াস নেই।	i. ব্যাকটেরিয়া কোষীয় এদের আদি প্রকৃতির নিউক্লিয়াস বিদ্যমান।
ii. এরা অতি-আণুবীক্ষণিক, এদের আকার ০.০১ হতে ০.৩ মাইক্রোমিটার।	ii. এর আণুবীক্ষণিক, এদের আকার ০.২ হতে ৫০ মাইক্রোমিটার।
iii. এতে সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ নেই।	iii. এতে সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ থাকে।
iv. এদের নিউক্লিক এসিড ক্যাপসিড-এর মধ্যে অবস্থান করে।	iv. এদের নিউক্লিক এসিড ক্যাপসিড-এর মধ্যে অবস্থান করে না।
v. কোষে DNA বা RNA যেকোনো একপ্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।	v. কোষে DNA বা RNA উভয় প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।

৬. উদ্ভীপকের গবেষক দলের যৌথ ব্রিফিং থেকে জানা যায় যে, প্রথম দলের অণুজীব তথা ডাইরাস দ্বিতীয় দলের অণুজীব তথা ব্যাকটেরিয়াকে ভক্ষণ করে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়। মূলত T_2 ফায় ডাইরাস *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে ভক্ষণ করে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়। এর সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়াটিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা—

i. সংক্রমণ পর্যায় : ব্যাকটেরিয়া কোষের সংস্পর্শে আসা হতে ডাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে এটি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের গায়ে লেগে যায়। লেগে থাকা স্থানের কোষপ্রাচীর ছিদ্র হয়ে যায় এবং ডাইরাস শুধুমাত্র তার জেনেটিক বস্তু (DNA) ব্যাকটেরিয়াম কোষে অন্তঃক্ষেপ দ্বারা প্রবেশ করিয়ে দেয়।

ii. সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায়: ডাইরাস DNA ও প্রোটিন আবরণ গঠন এবং নতুন ডাইরাস গঠন পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ডাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের এনজাইমকে সংগঠিত করে অনেক নতুন ডাইরাস DNA এবং সেই সাথে প্রোটিন আবরণ তৈরি করে। শেষ পর্যায়ে DNA ও প্রোটিন আবরণ মিলে নতুন ডাইরাস সৃষ্টি করে।

iii. বিগলন পর্যায় : ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীর ছিন্ন করে নতুন ডাইরাসগুলোর বের হয়ে আসাকে বিগলন পর্যায় বলে।

এভাবে মাত্র ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে ৩০০ নতুন ডাইরাস সৃষ্টি হতে পারে।

এভাবে, T_2 ফায় ডাইরাস *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে ভক্ষণ করে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায়।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ জীববিজ্ঞান ক্লাসে স্যার একধরনের আণুবীক্ষণিক জীব সম্পর্কে বর্ণনা করলেন, যার দেহে বংশগতীয় উপাদান ছাড়াও বৃত্তাকার DNA বিদ্যমান। এছাড়া আরেক রকমের অণুজীব আছে যারা অকোষীয় এবং অন্যান্য জীবের ক্ষতি করে থাকে।

(অমরপুরহাট সরকারি কলেজ/)

- ক. ম্যালেরিয়া কী? ১
- খ. হেপাটিক সাইজোগনি বলতে কী বোঝ? ২
- গ. দ্বিতীয় অণুজীবটি প্রথম অণুজীবকে ব্যবহার করে কীভাবে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়, ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. জীবজগতে অণুজীব দুটির উপকারী দিক বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ম্যালেরিয়া হলো এক ধরনের পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত জ্বর।

খ. মানুষের যকৃত কোষে ম্যালেরিয়া পরজীবীর যে অযৌন জনন সম্পন্ন হয় তাকে হেপাটিক সাইজোগনি বলে। হেপাটিক সাইজোগনি নিম্নলিখিত দুটি পর্যায়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যথা- প্রি-এরিসথ্রোসাইটিক হেপাটিক সাইজোগনি এবং এক্সো-এরিসথ্রোসাইটিক হেপাটিক সাইজোগনি।

গ. উদ্ভীপকের প্রথম অণুজীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া এবং দ্বিতীয় অণুজীবটি হলো ডাইরাস। কিন্তু ডাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে ব্যাকটেরিয়া কোষের মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি করে থাকে। যেমন— T_2 ফায় ডাইরাস *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে। এর সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—

সংক্রমণ পর্যায় : ব্যাকটেরিয়া কোষের সংস্পর্শে আসা হতে ডাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে এটি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের গায়ে লেগে যায়। লেগে থাকা স্থানের কোষ প্রাচীর ছিদ্র হয়ে যায় এবং ডাইরাস শুধুমাত্র তার জেনেটিক বস্তু (DNA) ব্যাকটেরিয়াম কোষে অন্তঃক্ষেপ দ্বারা প্রবেশ করিয়ে দেয়।

সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায়: ডাইরাস DNA ও প্রোটিন আবরণ গঠন এবং নতুন ডাইরাস গঠন পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ডাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের এনজাইমকে সংগঠিত করে অনেক নতুন ডাইরাস DNA এবং সেই সাথে প্রোটিন আবরণ তৈরি করে। শেষ পর্যায়ে DNA ও প্রোটিন আবরণ মিলে নতুন ডাইরাস সৃষ্টি করে।

বিগলন পর্যায় : ব্যাকটেরিয়ামের কোষপ্রাচীর ছিন্ন করে নতুন ডাইরাসগুলোর বের হয়ে আসাকে বিগলন পর্যায় বলে।

এভাবে মাত্র ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে ৩০০ নতুন ডাইরাস সৃষ্টি হতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, T_2 ফায় ডাইরাস সর্বদাই অন্যের সহায়তায় অর্থাৎ *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার সহায়তায় বংশবিস্তারে সক্ষম।

ঘ. জীবজগতে অণুজীব দুটি অর্থাৎ ডাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের বিভিন্ন উপকারী দিক রয়েছে। এর মধ্যে ডাইরাস দিয়ে বসন্ত, পোলিও, ধ্রুগ, জন্ডিস ও জলাভক্ষ রোগের প্রতিষেধক টিকা তৈরি করা হয়। জেনেটিক প্রকৌশলে বাহক হিসেবে এবং ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণে ডাইরাস ব্যবহৃত হয়। কতিপয় ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ দমনেও ডাইরাসের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। লাল টিউলিপ ফুলে ডাইরাস আক্রমণের ফলে বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়, এর ফলে ফুলের সৌন্দর্য এবং বাজারমূল্য বৃদ্ধি পায়।

আবার বিভিন্ন ধরনের প্রতিরক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিক আমরা ব্যাকটেরিয়া থেকে পেয়ে থাকি। কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি করা হয়। কিছু ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন সংবন্ধনের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। দুধ থেকে পনির, দই, মাখন, ছানা তৈরিতেও ব্যাকটেরিয়া প্রয়োজন হয়। পাটের আঁশ ছাড়াতে ব্যাকটেরিয়ার বিশেষ ভূমিকা পালন করে। চা, কফি ও তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যাকটেরিয়া নিঃসৃত এনজাইমের প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ হাসেম গ্রীষ্মের ছুটিতে বান্দরবন বেড়াতে গেল। বাড়ি ফেরার কয়েকদিন পর তার কাপুনিংস জ্বর শুরু হল। দুই দিন পর জ্বর এসে ঘাম দিয়ে জ্বর সারতো।

(সরকারি বঙ্গাবন্দু কলেজ, গোপালগঞ্জ/)

- ক. মেরোজাইগোট কী? ১
- খ. জীবাণুর নামসহ মানুষের ব্যাকটেরিয়াঘটিত ২টি রোগের নাম লিখ ২
- গ. রোগটির জ্বর আসার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. জীবাণুটির যে চক্রটি শেষে মানবদেহে জ্বর আসে তার চিত্রসহ ব্যাখ্যা দাও। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ব্যাকটেরিয়ার যৌন জননের ক্ষেত্রে গ্রহিতা কোষে যে অসম্পূর্ণ জাইগোট সৃষ্টি হয় তাই মেরোজাইগোট।

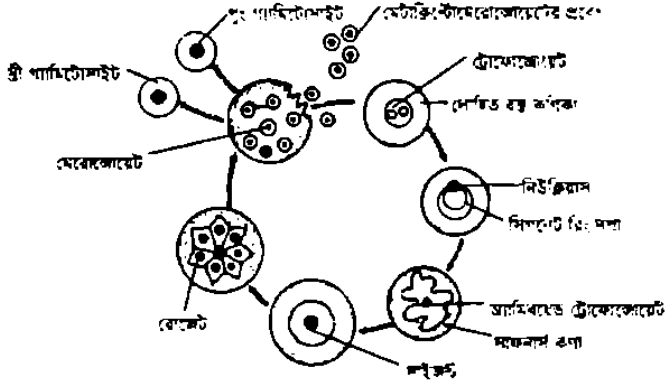
২ জীবাণুর নামসহ মানুষের ব্যাকটেরিয়াঘটিত দুটি রোগের নাম হলো—

রোগের নাম	জীবাণুর নাম
১. কলেরা	<i>Vibrio cholerae</i>
২. টাইফয়েড জ্বর	<i>Salmonella typhosa</i>

গ। হাসেম ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত ধারণা করা হতো যে পরজীবীর দেহ থেকে নিঃসৃত হিমোজেন নামক বিষাক্ত রক্তক পদার্থের কারণে বা কোনো বিষবস্তু ক্ষরণের ফলে মানুষের দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং জ্বর আসে। কিন্তু বর্তমান ধারণা অনুযায়ী ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত মানুষের দেহের লোহিত রক্ত কণিকার প্রাচীর ভেঙে মেরোজয়েটগুলো রক্তরসে প্রবেশ করে। মেরোজয়েটগুলো বহিরাগত বস্তু যা রক্তের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করে দেয় এ বহিরাগত বস্তুগুলোকে ধ্বংস করার জন্য রক্তের স্বেতকণিকা পাইরোজেন নামক এক প্রকার পদার্থ ক্ষরণ করে। স্বেতকণিকা যখন অতিরিক্ত পাইরোজেন ক্ষরণ করে তখন মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অংশ, বিশেষ করে তাপস্থলী কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়। তখন প্রোস্টাগ্যান্ডিন, মনোঅ্যামাইন প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ বেড়িয়ে আসে। এ খবর হাইপোথ্যালামাসের পেছন দিকটায় পৌঁছালে ভেসোমোটর স্নায়ুতন্ত্র উত্তেজিত হয়। এ উত্তেজনা দেহের প্রান্তীয় অঞ্চলের রক্তনালিগুলোকে সংকুচিত করে ফলে দেহ থেকে অতিরিক্ত তাপ বের হতে পারে না। এ কারণেই দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় অনেক বেড়ে যায়। দেহের এ তাপ বৃদ্ধিকে জ্বর বলে। ঠিক এ কারণেই হাসেমের শরীরে জ্বর আসে।

ঘ। জীবাণুটি হলো প্লাজমোডিয়াম যা ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ প্লাজমোডিয়ামের এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনির শেষে মানবদেহে জ্বর আসে।

হেপাটিক সাইজোগনির পর ম্যালেরিয়ার জীবাণু রক্তের লোহিত কণিকা আক্রমণ করে ও সেখানে অফোন (সাইজোগনি) প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে, যাকে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি বলে।



চিত্র : এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি

লোহিত কণিকার অভ্যন্তরে ট্রোফোজয়েট হিমোগ্লোবিনকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে আকারে বড় ও গোল হয়ে ট্রোফোজয়েটে পরিণত হয়। এসময় ট্রোফোজয়েটের কেন্দ্রে একটি গহ্বর উৎপন্ন হয় ও আকারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে একে রিং এর মতো দেখায়। এ অবস্থাকে সিগনেট রিং দশা বলে। সিগনেট রিং আধা ঘণ্টার মধ্যে অ্যামিবার ন্যায় অনিয়মিত ক্ষণপদযুক্ত অ্যামিবিয়ড ট্রোফোজয়েটে পরিণত হয়। এ পর্যায়ে লোহিত কণিকায় দানার ন্যায় সাফনার্স কণা দেখা দেয়। কিছু সময় পর ক্ষণপদ বিলুপ্ত হয় ও জীবাণু গোলাকার সাইজন্টে পরিণত হয়। এর সাইটোপ্লাজমে হিমোজয়েন নামক বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ জমা থাকে। সাইজন্ট লোহিত কণিকার অধিকাংশ স্থান দখল করে অবস্থান করে ও বহু বিভাজন প্রক্রিয়ায় মেরোজয়েটে উৎপন্ন করে। মেরোজয়েটগুলো ফুলের পাপড়ির মতো বিন্যস্ত থাকে, যা রোজেট দশা নামে পরিচিত। রক্ত কণিকা ভেঙে মেরোজয়েটে বেরিয়ে আসে ও পুনরায় নতুন লোহিত কণিকা আক্রমণ করে। প্রজাতিভেদে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি সমাপ্ত হতে ৪৮—৭২ ঘণ্টা সময় লাগে। লোহিত কণিকা ধ্বংস হবার কারণে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর দেহে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিনকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণের পর বিস্মৃত হিমোজয়েন নামক বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয়। লোহিত কণিকা ভেঙে মেরোজয়েট যখন বেরিয়ে আসে তখন হিমোজয়েন রক্ত রসে মিশে যায় ও কোষের উপর বিধিক্রিয়া সৃষ্টি করে। একই সাথে মেরোজয়েটগুলোকে ধ্বংস করার জন্য স্বেতকণিকা অতিরিক্ত পাইরোজেন নামক বিষাক্ত পদার্থ ক্ষরণ করে। এর ফলে রোগীর দেহে কম্পন দিয়ে প্রচণ্ড জ্বর আসে।

প্রশ্ন ৪৭ পূজার ছুটিতে মাসুদ সিরাজগঞ্জ বেড়াতে যেয়ে ৪/৫ দিন থাকার পর আবার ঢাকায় ফিরে আসলো। তার পরপরই কঠিন এক জ্বরে পড়ল, কোনোভাবেই জ্বর পড়ে না অবশেষে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নিকট গেলে রক্ত পরীক্ষা করার পর বললেন আপনার রক্তে এক বিশেষ জীবাণুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে, তবে ভয়ের কোনো কারণ নাই কিছু নিয়ম মেনে চললে এ রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

[কান্টনমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা]

- জন্মক্রম কী? ১
- মস ও ফার্নের পার্থক্য কর। ২
- উদ্ভীপকে উল্লিখিত জীবাণুটি মানবদেহের লোহিত রক্ত কণিকায় যে ধাপ অতিক্রম করে তার বর্ণনা দাও। ৩
- ডাক্তার কি কি নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দিলেন বলে তুমি মনে কর। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক। কোনো জীবের জীবনচক্র সম্পন্ন করতে গ্যামিটোসাইটিক পর্যায়ের সঙ্গে স্পোরোসাইটিক পর্যায়ের যে পালক্রম ঘটে তাই জন্মক্রম।

খ। মস ও ফার্নের পার্থক্য নিম্নরূপ—

মস	ফার্ন
১. আদি প্রকৃতির স্থলজ, তবে উভচর স্বভাবের।	১. অপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে সর্বোন্নত এরাই প্রথম স্থলজ উদ্ভিদ।
২. প্রধান দেহ গ্যামেটোসাইটিক (n)।	২. প্রধান দেহ স্পোরোসাইটিক (2n)।
৩. পরিবহন টিস্যু থাকে না।	৩. পরিবহন টিস্যু থাকে।

গ। মাসুম ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছে। Anopheles মশকীর মাধ্যমে ম্যালেরিয়া জীবাণু Plasmodium মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়। Anopheles মশকীর দংশনের মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার জীবাণু দ্বারা সাথী প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সাথীর যুক্ত কোষ থেকে বের হওয়া জীবাণুর মেরোজয়েট দশা লোহিত রক্তকণিকাকে আক্রমণ করে ভেতরে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তা সিগনেট রিং, অ্যামিবিয়ড ট্রোফোজয়েট দশা পার করে বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট সাইজন্ট দশায় পৌঁছায়। সাইজন্ট বহুবিভাজন প্রক্রিয়ায় মেরোজয়েটে উৎপন্ন করে এ সময় কোষে বিষাক্ত হিমোজয়েন উৎপন্ন হয়। লোহিত রক্তকণিকা ভেঙে মেরোজয়েটগুলো হিমোজয়েনসহ প্লাজমায় বেরিয়ে আসে এবং বিধিক্রিয়া সৃষ্টি করে। একই সাথে মেরোজয়েটগুলোকে ধ্বংস করার জন্য স্বেতকণিকা অতিরিক্ত পাইরোজেন নামক বিষাক্ত পদার্থ ক্ষরণ করে। আর এর ফলেই সাথীর কম্পন দিয়ে জ্বর শুরু হয়। পরবর্তীতে মেরোজয়েটগুলো পুনরায় লোহিত কণিকাকে আক্রমণ করে তার জীবনচক্র সম্পন্ন করতে থাকে। এ চক্রকে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি বলে।

ঘ। মাসুমের ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছে। এ রোগের হাত থেকে মুক্তি পেতে ডাক্তার তাকে কিছু নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দিলেন। যেমন— ঘরের দরজা বা জানালায় মশকীরোধী নেট ব্যবহার করে মশকীর দংশন হতে আত্মরক্ষা করা। এছাড়া কয়েল বা বিভিন্ন ধরনের স্প্রে ব্যবহার করা বা দেহের অনাবৃত অংশে বিশেষ ধরনের ক্রিম বা লোশন লাগানোর মাধ্যমে মশকীর দংশন হতে বাঁচা। শয়নের সময় মশারি ব্যবহার করা সম্ভাব্য ধূপের ধোয়া প্রয়োগ করা যায়।

মাসুমকে অবশ্যই উন্নত চিকিৎসা প্রদান করাতে হবে। রোগ শনাক্ত করা ও উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান করলে ম্যালেরিয়া রোগ হতে পরিচ্রাণ পাওয়া যায়। সিনকোনা গাছের বাকল হতে তৈরি কুইনাইন ম্যালেরিয়া নিরাময়ের মূল ঔষধ। এ কুইনাইন দ্বারাই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ তৈরি হয়েছে। যেমন— ক্রোরোকুইন, নিডাকুইন, কেমোকুইন, অ্যাভলোক্রোর, প্যালাড্রিন ইত্যাদিসহ ম্যালেরিয়া পরজীবী ধ্বংসের ভালো মানের বেশ কিছু ঔষধ বাজারে পাওয়া যায়। এছাড়া আক্রান্ত মাসুমকে যাতে মশকী দংশন করতে না পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে, নতুবা দ্রুত রোগের বিস্তার ঘটতে পারে।

দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর গবেষণার পর অবশেষে আবিষ্কৃত হয়েছে বিশ্বের প্রথম ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক টিকা "Mosquirix" যা RTS,S নামেও পরিচিত। European Medicine Agency (EMA) ইতোমধ্যেই এ Vaccine-কে স্বীকৃতি দিয়েছে। চার ডোজের এ টিকা *Plasmodium falciparum* জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকর অ্যান্টিবডি উৎপাদনে সক্ষম। তাই ভবিষ্যতে যেন অন্য ধরনের ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত না হয় সেজন্য মাসুম ম্যালেরিয়ার টিকা গ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৪৮ তৃণভোজী প্রাণীর অস্ত্রে খাদ্য হজমকারী এক ধরনের অণুজীব বাস করে। অপর একটি অণুজীব উপরোক্ত অণুজীবকে সংক্রমণ করে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়।

[কৃষিমা ডিপ্টোরিয়া সরকারি কলেজ]

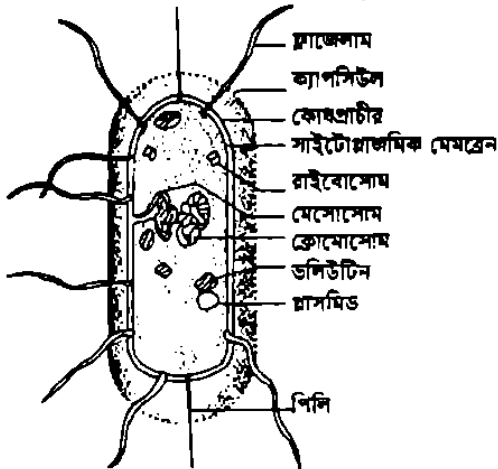
- | | |
|---|---|
| ক. জনুক্রম কী? | ১ |
| খ. সুক্রোজ রিডিউসিং সুগার নয় কেন? | ২ |
| গ. প্রথমোক্ত অণুজীবটির গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর। | ৩ |
| ঘ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত শেখোক্ত অণুজীবটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো জীবের জীবনচক্র সম্পন্ন করতে গ্যামিটোফাইটিক পর্যায়ে সাথে স্পোরোফাইটিক পর্যায়ে যে পালাক্রম ঘটে তাই জনুক্রম।

খ. সুক্রোজ রিডিউসিং সুগার নয়, এটি একটি নন-রিডিউসিং সুগার। যে সকল কার্বোহাইড্রেটে কমপক্ষে ১টি মুক্ত অ্যালডিহাইড ($-CHO$) বা কিটোন ($=CO$) গ্রুপ থাকায় ক্ষারীয় আয়নকে বিজারিত করতে পারে তাদেরকে বিজারক শর্করা বা রিডিউসিং সুগার বলে। কিন্তু সুক্রোজে মুক্ত অ্যালডিহাইড ($-CHO$) বা কিটোন ($=CO$) গ্রুপ না থাকায় ক্ষারীয় আয়নকে বিজারিত করতে পারে না তাই একে নন-রিডিউসিং সুগার বলে।

গ. তৃণভোজী প্রাণীর অস্ত্রে খাদ্য হজমকারী অণুজীব হলো ব্যাকটেরিয়া।



চিত্র : একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়াম কোষ

প্রতিটি ব্যাকটেরিয়াম কোষকে ঘিরে একটি জড় কোষপ্রাচীর থাকে। এর প্রধান উপাদান পেপটিডোগ্লাইকান। বহু ব্যাকটেরিয়াতে কোষ প্রাচীরকে ঘিরে জটিল কর্বোহাইড্রেট দিয়ে বা পলিপেপটাইড দিয়ে গঠিত একটি পুরু স্তর থাকে, যাকে ক্যাপসিউল বলে। অনেক ব্যাকটেরিয়াতে একটি ফ্ল্যাগেলাম বা একাধিক ফ্ল্যাগেলা থাকে। ফ্ল্যাগেলা ছাড়াও কোনো ব্যাকটেরিয়াতে খাটো ও শক্ত পিলি থাকে। সাইটোপ্লাজমকে বেষ্টিত করে

সজীব প্লাজমামেমব্রেন অবস্থিত। ব্যাকটেরিয়া কোষের প্লাজমামেমব্রেন কখনো কখনো ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে মেসোসোম গঠন করে সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় সাইটোপ্লাজম অবস্থিত। সাইটোপ্লাজম বর্ণহীন, স্বচ্ছ। এতে বিদ্যমান থাকে ছোট ছোট কোষ গহ্বর, চর্বি, শর্করা জাতীয় খাদ্য, প্রোটিন, খনিজ পদার্থ সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য অজ্ঞাণু হলো মৃত্ত রাইবোসোম এবং পলিরাইবোসোম। কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াসের পরিবর্তে কেবল মাত্র একটি ক্রোমোসোম থাকে, যা সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত। বহু ব্যাকটেরিয়াতে বৃহৎ ক্রোমোসোম ছাড়াও একটি ক্ষুদ্রাকার ও বৃত্তাকার ক্রোমোসোম থাকে, যাকে প্লাসমিড বলে।

ঘ. উদ্ভীপকের শেখোক্ত অণুজীবটি হলো ভাইরাস। মানবকুলের জন্য ভাইরাস যত না উপকারী তার চেয়ে বেশি অপকারী। ভাইরাস আক্রমণের ফলে মানুষের অস্থিত্ব, পঙ্গুত্ব, এমনকি অকাল মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। নিম্নে ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

ভাইরাসের অপকারিতা : ভাইরাস উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানবকুলের অনেক ক্ষতি করে থাকে যেমন :

১. ভাইরাস মানুষের বসন্ত, হাম, পোলিও, জলাতঙ্ক, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হার্পিস, ডেঙ্গু, ভাইরাল হেপাটাইটিস প্রভৃতি মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে থাকে।
২. বিভিন্ন উদ্ভিদের যেমন- শিমের মোজাইক রোগ, আলুর লিফরোল (পাতা কঁচকাইয়া যাওয়া), পেঁপের লিফকল, ক্রোরোসিস, ধানের টুংরো রোগসহ প্রায় ৩০০ উদ্ভিদ রোগ ভাইরাস দ্বারা ঘটে থাকে। এতে ফসলের উৎপাদন বিপুলভাবে হ্রাস পায়।
৩. গরুর বসন্ত, গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর, মহিষ ইত্যাদি প্রাণীর 'ফুট এন্ড মাউথ' রোগ অর্থাৎ এদের পা ও মুখের বিশেষ ক্ষতরোগ (খুরারোগ) এবং মানুষ, কুকুর ও বিড়ালের দেহে জলাতঙ্ক রোগ ভাইরাস দিয়েই সৃষ্টি হয়।
৪. ফায় ভাইরাস মানুষের কিছু উপকারী ব্যাকটেরিয়াকেও ধ্বংস করে থাকে।
৫. বহুল আলোচিত 'এইডস' রোগের কারণ হিসেবেও বিজ্ঞানীগণ ভাইরাসকে দায়ী করেছেন। HIV দিয়ে AIDS রোগ হয়। HIV দিয়ে আক্রান্ত হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না। এর ফলে অকাল মৃত্যু অবধারিত। বাংলাদেশে ক্রমেই এইডস রোগীর সংখ্যা এবং এ রোগে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমান বিশ্বে AIDS রোগীর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি।

এছাড়া ইবোলা, জিকা, নিপা, SARS, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, হেপাটাইটিস, সর্দিজ্বর, বিভিন্ন ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে।

ভাইরাসের উপকারিতা : বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করে ভাইরাসকে বিভিন্নভাবে মানুষের কিছু উপকারে আনতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন -

১. বসন্ত, পোলিও, প্লেগ এবং জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক টিকা ভাইরাস দিয়েই তৈরি করা হয়।
২. ভাইরাস হতে 'জন্ডিস' রোগের টিকা তৈরি করা যায়।
৩. কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদি রোগের ঔষধ তৈরিতে ব্যাকটেরিওফায় ভাইরাস ব্যবহার করা হয়।
৪. ভাইরাসকে বর্তমানে বহুল আলোচিত 'জেনেটিক প্রকৌশল'-বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।
৫. ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণে ভাইরাস ব্যবহার করা হয়।
৬. কতিপয় ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ দমনেও ভাইরাসের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। যুক্তরাষ্ট্রে NPV কে কীট পতঙ্গনাশক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়।
৭. ফায় ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে থাকে।
৮. লাল টিউলিপ ফুলে ভাইরাস আক্রমণের ফলে লম্বা লম্বা সাদা সাদা দাগ পড়ে, এর ফলে ফুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং ফুলের মূল্য বেড়ে যায়।

৯. অস্ট্রেলিয়ার খরগোষের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় ফসলের চরম ক্ষতি হচ্ছিল। Myxovirus-এর সংক্রমণে খরগোষ নিধন করে তাদের সংখ্যা কমানো হয়েছে।

প্রশ্ন ৪৯



A-অণুজীব

[উত্তর, চি. এ দাবা: স্কুল এন্ড কলেজ, ব্যাড়া]

- | | |
|------------------------------------|---|
| ক. নিউক্লিক অ্যাসিড কী? | ১ |
| খ. ভাইরাস জড় না জীব? ব্যাখ্যা কর | ২ |
| গ. A-অণুজীবটির গঠন বর্ণনা কর | ৩ |
| ঘ. A-অণুজীবটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর | ৪ |

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. অসংখ্য নিউক্লিওটাইড পলিমার সৃষ্টির মাধ্যমে যে অ্যাসিড তৈরি করে তাই হলো নিউক্লিক অ্যাসিড।

খ. ভাইরাস হলো অতি আণুবীক্ষণিক, অকোষীয় এক প্রকার সত্তা। ভাইরাস সজীব কোষের অভ্যন্তরে বংশবৃদ্ধি করে এবং পরিব্যক্তি ও অভিব্যক্তি দেখা যায়। আবার সজীব কোষের বাইরে জড় বস্তুর ন্যায় আচরণ করে। অর্থাৎ কোষের বাইরে ভাইরাসের কোন জৈবিক কার্যকলাপ ঘটে না। ভাইরাস জড় ও জীব উভয়ের ন্যায় বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। তাই ভাইরাসকে জড় ও জীবের সংযোগসূত্রও বলা হয়।

গ. উদ্ভীপকের চিত্র A হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া। প্রতিটি ব্যাকটেরিয়াম কোষকে ঘিরে একটি জড় কোষপ্রাচীর থাকে। এর প্রধান উপাদান পেপটিডোগ্লাইকান। বহু ব্যাকটেরিয়াতে কোষপ্রাচীরকে ঘিরে জটিল ক্যাপসুল দিয়ে বা পলিপেপটাইড দিয়ে গঠিত একটি পুরু স্তর থাকে, যাকে ক্যাপসিউল বলে। অনেক ব্যাকটেরিয়াতে একটি ফ্ল্যাজেলাম বা একাধিক ফ্ল্যাজেলা থাকে। ফ্ল্যাজেলা ছাড়াও কোনো ব্যাকটেরিয়াতে খাটো ও শক্ত পিলি থাকে। সাইটোপ্লাজমকে বেষ্টিত করে সজীব প্লাজমামেমব্রেন অবস্থিত। ব্যাকটেরিয়া কোষের প্লাজমামেমব্রেন কখনো কখনো ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে মেসোজোম গঠন করে। সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় সাইটোপ্লাজম অবস্থিত। সাইটোপ্লাজম বর্ণহীন, স্বচ্ছ। এতে বিদ্যমান থাকে ছোট ছোট কোষ গহ্বর, চর্বি, শর্করা জাতীয় বাদ্য, প্রোটিন, খনিজ পদার্থ। সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য অজাগু হলো মূত্র রাইবোসোম এবং পলিরাইবোসোম। কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াসের পরিবর্তে কেবল মাত্র একটি ক্রোমোসোম থাকে, যা সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত। বহু ব্যাকটেরিয়াতে বৃহৎ ক্রোমোসোম ছাড়াও একটি ক্ষুদ্রাকার ও বৃত্তাকার ক্রোমোসোম থাকে, যাকে প্লাসমিড বলা হয়।

ঘ. চিত্র A এর অণুজীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া। চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাণরক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা তৈরি হয়। বিভিন্ন প্রতিষেধক টিকা যেমন- কলেরা, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, ডি.পি.টি ইত্যাদি রোগের টিকা ব্যাকটেরিয়া হতে প্রস্তুত করা হয়। কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া মাটির জৈব পদার্থ সঞ্চার করে উর্বরতা বৃদ্ধি করে। নানাবিধ আবর্জনা পচানোর মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া জৈব সার প্রস্তুত করে। কিছু ব্যাকটেরিয়া মাটিতে নাইট্রোজেন স্থাপন করে আবার কিছু ব্যাকটেরিয়া শিম জাতীয় উদ্ভিদের মূলের নডিউলে নাইট্রোজেন সংবন্ধনের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। কিছু ব্যাকটেরিয়া জমিতে ক্ষতিকর পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে আবার কিছু ব্যাকটেরিয়া ফসলের ফলন বৃদ্ধিতেও ব্যবহৃত হয়।

শিল্প ক্ষেত্রেও ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহার ব্যাপক। চা, কফি, তামাক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণে, দুগ্ধজাত শিল্পে, পাট শিল্পে, চামড়া তৈরি, ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি, অ্যাসিটোন তৈরি ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হয়।

মানুষের অন্ত্রের E. coli ও অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া ভিটামিন-বি, ভিটামিন-কে, ভিটামিন-বি_{১২}, ফোলিক অ্যাসিড, বায়োটিন প্রভৃতি পদার্থ প্রস্তুত ও সরবরাহ করে থাকে। জিন প্রকৌশলেও ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব অপরিহার্য। এছাড়াও আবর্জনা পচনে, পয়ঃনিষ্কাশনে, পানিতে ভাসমান তেল অপসারণেও ব্যাকটেরিয়ার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রেই ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ৫০ পৃথিবীতে এমন অসংখ্য জীব আছে যাদের আমরা খালি চোখে দেখতে পাইনা। এদের দেখার জন্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র প্রয়োজন হয়। তাই এরা অণুজীব নামে পরিচিত। এসকল অণুজীবের মধ্যে কিছু আছে যারা জীবকোষ ব্যতীত সংখ্যাবৃদ্ধিতে অক্ষম। আবার কিছু জীবকে আমরা জীব প্রযুক্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছি যারা অন্য সজীব কোষ ব্যতীত বংশবৃদ্ধির সক্ষম।

[উত্তর, চি. এ দাবা: স্কুল এন্ড কলেজ, ব্যাড়া]

- | | |
|--|---|
| ক. প্রোটোপ্লাজমের চলন কী নামে পরিচিত? | ১ |
| খ. মায়োসিস কেন হয়? | ২ |
| গ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত প্রথম জীবটির গঠন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। | ৩ |
| ঘ. উদ্ভীপকের শেষোক্ত জীবটির ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের যৌন জনন সম্পন্ন হয়-উদ্ভিতির সত্যতা যাচাই পূর্বক তোমার মতামত দাও। | ৪ |

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. প্রোটোপ্লাজমের চলন সাইক্রোসিস বা আবর্তন নামে পরিচিত।

খ. যৌন জননশীল সকল জীবে হ্যাপ্লয়েড (n) পুংগ্যামিট এবং স্ত্রীগ্যামিটের মিলনের মাধ্যমে ডিপ্লয়েড (2n) জাইগোট গঠিত হয়। এ জাইগোট সাধারণত মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ বহুকোষী জীবদেহ গঠন করে। জীবদেহ থেকে গ্যামিট সৃষ্টির প্রাক্কালে যদি ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেক না নেমে যেতো তাহলে এমন ২টি ডিপ্লয়েড গ্যামিটের মিলনে দ্বিতীয় প্রজন্মে টেট্রাপ্লয়েড (4n) জাইগোট সৃষ্টি হতো। এভাবে প্রতি প্রজন্মে জাইগোটে ক্রোমোসোমের সংখ্যা দ্বিগুণ, চারগুণ এভাবে বাড়তে থাকতো। প্রতি প্রজন্মের জীবের বৈশিষ্ট্য ব্যাপক তারতম্য সংঘটিত হতো। মায়োসিসের মাধ্যমে জনক্রম হয় বলেই সকল প্রজন্মের মধ্যে ক্রোমোসোম সংখ্যা ধ্রুব থাকে এবং বংশগতিয় বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্যতা বজায় থাকে।

গ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত প্রথম জীবটি হলো ভাইরাস। ভাইরাস জীবকোষ ব্যতীত সংখ্যাবৃদ্ধিতে অক্ষম। ভাইরাসের গঠন বৈশিষ্ট্যকে ভৌত ও রাসায়নিক গঠন হিসেবে ভাগ করা যেতে পারে।

ভাইরাসের ভৌত গঠন : ভাইরাসের ভৌত গঠন নিম্নরূপ :

১. কেন্দ্রে অবস্থিত কেন্দ্রীয় বস্তু তথা নিউক্লিক এসিড যা DNA অথবা RNA দিয়ে গঠিত।
 ২. কেন্দ্রীয় বস্তুকে ঘিরে অবস্থিত ক্যাপসিড তথা প্রোটিন আবরণ। ক্যাপসিডের প্রোটিন অণুর বিন্যাসই ভাইরাসের আকার-আকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। প্রোটিন অণু সজ্জিত হয়ে দণ্ডাকৃতির হেলিক্স এবং গোলাকৃতির পলিহেড্রন কাঠামো গঠন করে। ক্যাপসিড কতগুলো সাবইউনিট নিয়ে গঠিত। সাবইউনিটকে বলা হয় ক্যাপসোমিয়ার (capsomere)। ক্যাপসোমিয়ারের সংখ্যা ও ধরণ বিভিন্ন প্রকার ভাইরাসে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ক্যাপসিডের বহিস্থ আবরণ মসৃণ, কখনো কণ্টকিতও হতে পারে।
 ৩. কোনো কোনো ভাইরাসে ক্যাপসিডের বাইরে ক্যাপসিডকে ঘিরে অপর একটি আবরণ থাকে।
- ভাইরাসের রাসায়নিক গঠন : রাসায়নিকভাবে ভাইরাস প্রধানত দুই প্রকার বস্তু নিয়ে গঠিত। যথা- নিউক্লিক অ্যাসিড (কেন্দ্রীয় বস্তু) এবং প্রোটিন (ক্যাপসিড)।

১. নিউক্লিক অ্যাসিড (কেন্দ্রীয় বস্তু) : ভাইরাসের কেন্দ্রে অবস্থিত নিউক্লিক অ্যাসিড। নির্দিষ্ট ভাইরাসে নিউক্লিক অ্যাসিড DNA অথবা RNA এর যে কোনো এক ধরনের হয়। কখনো একই সাথে DNA এবং RNA অবস্থান করে না। অন্যান্য জীবদেহে একই সাথে DNA এবং RNA অবস্থান করে।

২. প্রোটিন (ক্যাপসিড) : প্রোটিন অণু দিয়ে ক্যাপসিড গঠিত। ক্যাপসিড সাধারণত জৈবিক দিক দিয়ে নিষ্ক্রিয়। ক্যাপসিডের প্রধান কাজ হলো নিউক্লিক অ্যাসিডকে রক্ষা করা, তবে এরা পোষক দেহে সংক্রমণেও সহায়তা করে। এটি অ্যান্টিজেন হিসেবেও কাজ করে।

৬. উদ্ভীপকের শেষোক্ত জীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া। সাধারণত ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে যৌন জনন না ঘটলেও *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে যৌন প্রবণতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে বিপরীত যৌনধর্মী (+, -) দুটি ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে আকর্ষণের ফলে বংশগতীয় বস্তু স্থানান্তর হয় এটি কনজুগেশন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় দুটি ব্যাকটেরিয়া কোষ (একটি দাতা কোষ (+) এবং একটি গ্রহীতা কোষ (-) একত্রে এসে পাশাপাশি অবস্থান করে। পরে দুটি পাশাপাশি অবস্থিত কোষের মিলিত প্রাচীরের একস্থানে কোষপ্রাচীর বিগলিত হয়ে একটি সংযোগ নালী সৃষ্টি করে এই কনজুগেশন নালীপথে দাতাকোষের ক্রোমোসোম গ্রহীতাকোষে প্রবেশ করতে থাকে কিন্তু ক্রোমোসোমের আংশিক প্রবেশ করার পরই ব্যাকটেরিয়া দুটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ব্যাকটেরিয়ার যৌন জননে গ্রহীতাকোষ দাতাকোষের আংশিক ক্রোমোসোম নিয়ে যে জাইগোট তৈরি করে তাকে মেরোজাইগোট বলে। মেরোজাইগোট দ্বি-বিভাজনের মাধ্যমে পুনরায় সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়। এ প্রক্রিয়ায় কোনো সংখ্যাবৃদ্ধি হয় না, বরং দাতা কোষ আংশিক ক্রোমোসোম হারিয়ে অচিরেই নষ্ট হয়ে যায়, ফলে প্রথমে সংখ্যাবৃদ্ধির পরিবর্তে সংখ্যা হ্রাস পায়। কাজেই এই প্রক্রিয়াকে জনন প্রক্রিয়া না বলে রিকম্বিনেশন প্রক্রিয়া বলাই উত্তম।

যেহেতু এ পদ্ধতি স্বাভাবিক যৌন জননের মত নয় তাই একে বিশেষ ধরনের যৌন জনন বলা যায়। আবার আমরা লক্ষ করলে বুঝতে পারি যে, এখানে কোনো গ্যামিট সৃষ্টি হয় না, কোনো মায়োসিস বিভাজন হয় না। কোনো ডিপ্লয়েড কোষ তৈরি হয় না, কোনো জাইগোটও তৈরি হয়। এক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধিও ঘটে না। তাই প্রকৃতপক্ষে ব্যাকটেরিয়ার যৌন জনন ঘটে না।

প্রশ্ন ৫১ উচ্চতর গবেষণার জন্য দুই দল গবেষক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান গবেষণাগারে অণুজীব নিয়ে গবেষণার কাজ করছেন।

প্রথম দল: অকোষীয় রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব নিয়ে কাজ করেছেন।

দ্বিতীয় দল: আদি কোষীয় অণুজীব নিয়ে কাজ করেছেন। গবেষক দলের যৌথ বিজ্ঞান জানা গেল প্রথম দলের অণুজীব দ্বিতীয় দলের অণুজীবকে ভক্ষণ করে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়।

(নিউ গড: দ্বিতীয় কলেক, রাজশাহী)

ক. মেরিস্টেম কালচার কি? ১

খ. ফটোফসফোরাইলেশন বলতে কী বুঝ? ২

গ. প্রথম ও দ্বিতীয় গবেষক দল যে অণুজীব নিয়ে কাজ করছেন, সেই অণুজীবদ্বয়ের মধ্যে গঠনগত পার্থক্য লিখ। ৩

ঘ. গবেষক দলের যৌথ বিজ্ঞান এ যে বিষয়টি জানা গেল সে প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মেরিস্টেম কালচার হলো টিস্যুকালচারের একটি বিশেষ দিক, এক্ষেত্রে উদ্ভিদের শীর্ষমুকুলের অগ্রভাগের টিস্যুকে কালচার করা হয়।

খ. কোনো যৌগের সাথে ফসফেট সংযুক্তি প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফসফোরাইলেশন। আর আলোক শক্তি ব্যবহার করে ফসফোরাইলেশন ঘটানোকে বলা হয় ফটোফসফোরাইলেশন। অর্থাৎ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলোক শক্তি ব্যবহার করে ATP তৈরি করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফটোফসফোরাইলেশন।

গ. প্রথম ও দ্বিতীয় গবেষক দল যে অণুজীব নিয়ে কাজ করেছেন সেগুলো হলো যথাক্রমে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া। নিচে এদের মধ্যে গঠনগত পার্থক্য দেয়া হলো —

ভাইরাস	ব্যাকটেরিয়া
i. এরা অকোষীয় এবং এতে নিউক্লিয়াস নেই।	i. এরা কোষীয় এবং এতে আদি প্রকৃতির নিউক্লিয়াস থাকে।
ii. এরা সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।	ii. সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে।
iii. এতে সাইটোপ্লাজম বা অন্য কোনো ক্ষুদ্রাঙ্গ নেই।	iii. এতে সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ আছে।
iv. এদের দেহে কোনো এনজাইম থাকে না।	iv. এদের দেহকোষে এনজাইম থাকে।
v. ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিড এর মধ্যে অবস্থান করে।	v. ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিড এর মধ্যে অবস্থান করে না।
vi. এদের মধ্যে DNA বা RNA যেকোনো এক প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।	vi. এদের মধ্যে DNA বা RNA যেকোনো উভয় প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।

ঘ. প্রথম দলের গবেষকের ব্যবহৃত অণুজীবটি অর্থাৎ ভাইরাস দ্বিতীয় দলের অণুজীব অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া ভক্ষণ করে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়। এসব ভাইরাস ব্যাকটেরিওফায় নামে পরিচিত। যেমন- T_২ ফায় ভাইরাস *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে বংশবৃদ্ধি ঘটায়। এদের বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় —

সংক্রমণ পর্যায় : ব্যাকটেরিয়া কোষের সংস্পর্শে আসা হতে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে এটি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের গায়ে লেগে যায়। লেগে থাকা স্থানের কোষপ্রাচীর ছিদ্র হয়ে যায় এবং ভাইরাস শুধুমাত্র তার জেনেটিক বস্তু (DNA) ব্যাকটেরিয়াম কোষে অন্তঃপ্রবেশ দ্বারা প্রবেশ করিয়ে নেয়।

সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায় : ভাইরাস DNA ও প্রোটিন আবরণ গঠন এবং নতুন ভাইরাস গঠন পর্যন্ত এ পর্যায়ে বিস্তৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের এনজাইমকে সংগঠিত করে অনেক নতুন ভাইরাস DNA এবং সেই সাথে প্রোটিন আবরণ তৈরি করে। শেষ পর্যায়ে DNA ও প্রোটিন আবরণ মিলে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করে।

বিগলন পর্যায় : ব্যাকটেরিয়ামের কোষপ্রাচীর ছিন্ন করে নতুন ভাইরাসগুলোর বের হয়ে আসাকে বিগলন পর্যায় বলে।

এভাবে মাত্র ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে ৩০০ নতুন ভাইরাস সৃষ্টি হতে পারে।

প্রশ্ন ৫২ ভবেশ বোস জুরে আক্রান্ত, তার রক্তের বায়োকেমিক্যাল পরীক্ষায় হিমোগ্লোবিন পাওয়া গেল এবং রক্তে লোহিত কণিকার পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কম। (নিউ গড: দ্বিতীয় কলেক, রাজশাহী)

ক. মনোস্যাকারাইড কী? ১

খ. কোষচক্র বলতে কী বুঝ? ২

গ. ভবেশ বোসের রক্তে হিমোগ্লোবিন যে দশায় আসে সে দশাটির বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. ভবেশ বোসের রক্তে লোহিত কণিকার স্বল্পতার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৫২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে কার্বোহাইড্রেটকে হাইড্রোলাইসিস করলে আর কোনো সরল কার্বোহাইড্রেট একক পাওয়া যায় না সেগুলোই মনোস্যাকারাইড।

খ. কোষ সৃষ্টি, এর বৃদ্ধি এবং পরবর্তীতে বিভাজন এ তিনটি কাজ যে চক্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাকে কোষচক্র বলে। কোষচক্র ইন্টারফেজ

এবং মাইটোটিক ফেজ নিয়ে গঠিত। ইন্টারফেজ হলো কোষ বিভাজন শুরু করার প্রস্তুতি পর্ব। আর মাইটোটিক ফেজে প্রোফেজ, প্রো-মেটাফেজ, মেটাফেজ, আনাফেজ ও টেলোফেজ ধাপগুলো ঘটে থাকে।

গ ভবেশ বোস ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত। ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে হিমোজোয়াইন দেখা দেয় সাইজন্ট দশায়। এক্ষেত্রে ম্যালেরিয়া জীবাণুর ক্ষণপদ বিলুপ্ত হয়ে জীবাণুটি গোলাকার হয়ে যায় এবং এর নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয়ে ১২-১৪টি নিউক্লিয়াস গঠন করে। এ দশাকে বলা হয় সাইজন্ট। এ সময় জীবাণুর সাইটোপ্লাজমে হিমোজয়েন নামক বর্জ্য পদার্থ জমা হয়। সাইজন্টের নিউক্লিয়াসগুলো সাইটোপ্লাজম দ্বারা বেষ্টিত হওয়ার সময় গোলাপের পাপড়ির মতো দুটি স্তরে বিন্যস্ত হয়। এ অবস্থা রোজেট দশা নামে পরিচিত।

ঘ ভবেশ বোস ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় তার রক্তে লোহিত কণিকার স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। নিম্নোক্ত কারণে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত রোগীর দেহে লোহিত কণিকার স্বল্পতা দেখা দেয় বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা—

১. প্রতিটি লোহিত রক্তকণিকার ভেতর থেকে যখন গড়ে ১২-১৮টি মেরোজয়েট বেরিয়ে আসে তখন কণিকাগুলো ভাঙে এবং বিনষ্ট হয়।
২. নতুন প্রতিটি মেরোজয়েট আবার একেকটি নতুন লোহিত কণিকার ভেতরে ঢুকে উপরোক্ত প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে। এভাবে লোহিত কণিকা ধ্বংসের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়।
৩. তাদের শরীরে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা দুর্বল তাদের ক্ষেত্রে অনাক্রান্ত লোহিত কণিকাও ভেঙে যায়।
৪. ম্যালেরিয়ার তীব্র আক্রমণের সময় মজ্জার কাজে বাধা পড়ে, ফলে লোহিত কণিকা তৈরিতে বিঘ্ন জন্মে দেখা দেয় (যতটা লৌহ দরকার ততটা পায় না বলে মজ্জার লোহিত কণিকা সৃষ্টির ক্ষমতা কমে যায়)।
৫. প্লীহা অনেক বড় হয়ে যায়, ফলে সেখানে প্রচুর রক্ত জমা হয়, কোথাওবা রক্তপাত হয় এবং রক্তের দলা জমে বা জুড়ে যায়। এ কারণে রক্তস্বল্পতা হয়।

ভবেশ বোসের শরীরে ম্যালেরিয়া জীবাণু আক্রমণে উপরের ঘটনাগুলো ঘটায় তার রক্তে লোহিত কণিকার স্বল্পতা দেখা দিয়েছে।

প্রশ্ন ৫৩ মানিকের পাতলা পায়খানা আরম্ভ হয়েছে; অনেকটা চাল ধোয়া পানির মত। কোন ব্যথা নেই তবে মলের সাথে রক্তও দেখা যায়। বমি বমি ভাব এবং মাঝে মাঝে কম পরিমাণে বমি হতে থাকে। দেহে পানি শূন্যতা দেখা দিয়েছে। মাংসপেশিও মাঝে মাঝে সংকুচিত হয়। চোখ কোটরাগত ও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তীব্র পানি পিপাসা। এত পানি-শূন্যতায় দেহে ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্যে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

[মুরারিচাঁদ কলেক, সিলেট]

- ক. প্রাজমিড কী? ১
- খ. এন্ডোস্পোর বলতে কী বুঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাধিতে মানিকের ব্যাধি কি কি ভাবে ছড়াতে পারে উল্লেখ কর। ৩
- ঘ. মানিক এই ব্যাধির বিরুদ্ধে কী কী প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিজে সুস্থ থাকতে পারে এ-ব্যাপারে তোমার সুস্পষ্ট মতামত দাও। ৪

৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাকটেরিয়ার কোষে ক্রোমোসোম বহির্ভূত গোলাকার স্বতন্ত্র DNAই হলো প্রাজমিড।

খ প্রতিকূল পরিবেশে খাদ্যের অভাব ঘটলে কিছু ব্যাকটেরিয়ার কোষের চারদিকে পুরু আবরণ সৃষ্টি হয়। এই আবরণের ভেতরে প্রোটোপ্লাজম সংকুচিত অবস্থায় থাকে। একেই এন্ডোস্পোর বলে। এন্ডোস্পোরের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার অযৌন জনন ঘটে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মানিকের রোগের লক্ষণ থেকে বোঝা যায় তার কলেরা হয়েছে। কলেরা রোগ যেভাবে ছড়াতে পারে তা নিচে উল্লেখ করা হলো—

Vibrio cholerae নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ ছড়ায়। এটি একটি পানিবাহিত রোগ। সুস্থ লোকের পেটে জীবাণু না যাওয়া পর্যন্ত এ রোগ হয় না। সুস্থ লোক আক্রান্ত লোকের মলের উপর দিয়ে হেটে গেলে বা আক্রান্ত রোগীর মল বা বমি শরীরে মেখে গেলেও এ রোগ হয় না। মল দ্বারা দূষিত পানি এবং খোলা ও বাসি খাবার রোগীর পেটে ঢুকে রোগের সংক্রমণ ঘটায়। মাছ দ্বারা রোগীর মল ও বমি, খাদ্যকে দূষিত করে। আর সেই দূষিত খাবার গ্রহণের মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে বা ছড়িয়ে যায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মানিক এই ব্যাধির বিরুদ্ধে যে সকল প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সুস্থ থাকতে পারে, সে ব্যাপারে নিচে আমার সুস্পষ্ট মতামত তুলে ধরলাম—

প্রতিকার :

- i. যথাসম্ভব দ্রুত চিকিৎসা শুরু করতে হবে। পানিশূন্যতা রোধে প্রথমেই খাবার স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে। তৈরি স্যালাইন সহজলভ্য না হলে ফুটানো পানি, লবণ ও গুড় দিয়ে সহজেই বাড়িতে স্যালাইন তৈরি করতে হবে।
- ii. রোগী মুখে স্যালাইন গ্রহণ করতে না পারলে শিরার মাধ্যমে স্যালাইন অর্থাৎ শিরায় আইভি ফ্লাইড (ইন্ট্রিভেনাস ফ্লাইড) দিতে হবে।
- iii. রোগের সংক্রমণ গুরুতর হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টেট্রাসাইক্লিন, এরিথ্রোমাইসিন বা সিপ্ত্রোফ্লাক্সিসিন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে।

প্রতিরোধ :

- i. কলেরা একটি পানিবাহিত রোগ। কাজেই বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে এ রোগ অনেকাংশে প্রতিরোধ করা যায়।
- ii. খোলা ও বাসি খাবার এবং পানীয় বর্জন করতে হবে।
- iii. শাকসবজি ও ফল-মূল ভালো করে ধুয়ে খেতে হবে। খাবার গ্রহণ করার আগে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।
- iv. রোগীর মলমূত্র ও বমিযুক্ত কাপড়-চোপড় পুকুর বা খালে-বিলে না ধুয়ে সিন্ধ করে রোদে শুকিয়ে ফেলতে হবে।
- vi. যথাসময়ে কলেরা রোগের টিকা গ্রহণ করলে এ রোগ থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

প্রশ্ন ৫৪ মীনার যকৃত বড় হয়ে গেছে; জন্ডিস হওয়ায় দেহত্বক, মুখ, চোখ হয়ে গেছে হলুদ বর্ণের। রক্তে বেড়ে গেছে বিলিরুবিনের মাত্রা। খাওয়া অবু্চি, জ্বরও দেখা দিয়েছে।

[মুরারিচাঁদ কলেক, সিলেট]

- ক. ক্যাপসিড কী? ১
- খ. লাইটিক ও লাসোজেনিক চক্র বলতে কী বুঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রোগের ক্ষেত্রে দায়ী জীবাণু কীভাবে বিস্তার লাভ করে? ৩
- ঘ. 'প্রতিকারই প্রতিরোধ' উক্তিটি এই রোগের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা কর। ৪

৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভাইরাসের প্রোটিন আবরণই ক্যাপসিড।

খ যে প্রক্রিয়ায় ফায় ভাইরাস পোষক ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করে সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পন্ন করে এবং অপত্য ভাইরাসগুলো পোষক দেহের বিদারণ ঘটিয়ে নির্গত হয় তখন তাকে লাইটিক চক্র বলে। অপরদিকে যে প্রক্রিয়ায় ফায় ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার কোষে প্রবেশের পর ভাইরাল DNAটি ব্যাকটেরিয়াল DNA অণুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে প্রতিলিপি গঠন করে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসরূপে ব্যাকটেরিয়া কোষের বিদারণ ঘটে না তাকে লাসোজেনিক চক্র বলে।

গ উদ্দীপক অনুসারে, মীনার যকৃত বড় হয়ে গিয়েছে। জন্ডিস হওয়ায় দেহত্বক, চোখ, মুখ হলুদ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং, মীনা ভাইরাল হেপাটাইটিস রোগে আক্রান্ত। হেপাটাইটিস রোগের কারণ

হেপাটাইটিস-B ভাইরাস, এছাড়া হেপাটাইটিস-A ভাইরাস (HAV), হেপাটাইটিস-C ভাইরাস (HCV) ও হেপাটাইটিস-D ভাইরাস (HDV) ও হেপাটাইটিস-E ভাইরাস (HEV) নিয়েও লিভার প্রদাহ হয়ে থাকে। নিচে হেপাটাইটিস ভাইরাসের বিস্তার প্রক্রিয়া দেয়া হলো—

১. আক্রান্ত যায়ের বুকের দুধপানের মাধ্যমে শিশু আক্রান্ত হতে পারে।
২. আক্রান্ত ব্যক্তির ইনজেকশনের সিরিঞ্জের মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তির দেহে এ ভাইরাস প্রবেশ করতে পারে।
৩. অনিরাপদ যৌন মিলনের মাধ্যমেও এ ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে এছাড়া মাইটোমেগালো ভাইরাস, এপিষ্টেন বার ভাইরাস। হারপেস জোস্টার ভাইরাস কোনো কোনো সময় শিশুর হেপাটাইটিস সৃষ্টি করে।

ঘ উদ্দীপকে, মীনা হেপাটাইটিস রোগে আক্রান্ত। এক্ষেত্রে প্রতিকারই যে প্রতিরোধ তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

অধিকাংশ হেপাটাইটিস রোগীর হেপাটাইটিস-এ, হেপাটাইটিস-ই হসপিটালে ভর্তির প্রয়োজন পড়ে না। হেপাটাইটিস আক্রান্ত রোগীর প্রচুর বিশ্রাম ও গুণকোজ সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ প্রয়োজন। মাতৃদেহ থেকে সন্তানে যাতে ভাইরাস প্রবেশ না করতে পারে এজন্য গর্ভবতী মায়েদের টিকা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। হেপাটাইটিস-বি ও সি দ্বারা আক্রান্ত রোগীর পরবর্তীতে লিভার ক্যান্সার ও লিভার সেরোসিস হতে পারে বলে সূচিকিৎসা অত্যন্ত জরুরি। তবে সুনির্দিষ্ট কোনো ঔষধ এখনও আবিষ্কার হয়নি। অ্যান্টিভাইরাস ঔষধ পেনগাসিস এবং রিবাভাইরিন বাংলাদেশে উৎপন্ন হয় ও বাজারে সহজ প্রাপ্য। তবে হেপাটাইটিস-বি এর জন্য প্রতিরোধী টিকা আবিষ্কার হয়েছে।

হেপাটাইটিস রোগীর জন্য সহজপাচ্য খাবার অল্প অল্প করে বার বার দিতে হবে। অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার, মাদক ও তন্দ্রাদায়ক ঔষধ অবশ্য বর্জনীয়। রোগীকে ঘন ঘন পানি পান করতে হবে এবং পরিমিত বিশ্রামসহ শারীরিক পরিশ্রম পরিহার করতে হবে।

শুধু স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করেই অধিকাংশ ভাইরাস দ্বারা যকৃতের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার, প্রয়োজনে পানি ভালোভাবে ফুটিয়ে পান করা প্রয়োজন। পায়খানার পর, শিশুদের ডায়াপার পরিবর্তনের সময়, রান্নার আগে ভালোভাবে হাত সাবান বা জীবাণুনাশক দিয়ে ধোয়ার ব্যবস্থা নিলে এ ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ হয়। সিরিজ ও অন্যান্য মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি এবং রক্ত নেওয়ার আগে পরীক্ষা করে নিতে হবে। যেকোনো বয়সের লোক হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের টিকা গ্রহণ করে রোগ প্রতিরোধ করতে পারে

প্রশ্ন ▶ ৫৫ *Plasmodium* গণভুক্ত অন্ততঃ ৬০টি প্রজাতি মানুষসহ অন্যান্য মেবুদভী প্রাণীতে এক ধরনের মারাত্মক জ্বর-রোগ সৃষ্টি করে। এ রোগে লোহিত রক্ত কণিকা ও যকৃত কোষ ধ্বংস হয়। *[মুরারিচাঁদ কলজ, সিঙ্গেট]*

- ক. ভেক্টর কী? ১
- খ. কেবল অ্যানোফিলিস মশকী ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জীবাণুটি যকৃতে কিসে সংখ্যা বৃদ্ধি করে? ৩
- ঘ. অ্যানোফিলিস মশকীই পরজীবীটির প্রাথমিক পোষক-ব্যাখ্যা কর। ৪

৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

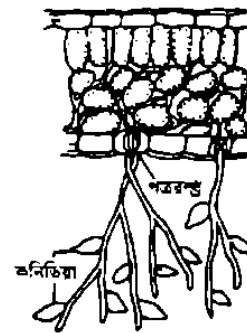
ক রোগজীবাণুর বাহকই হলো ভেক্টর।

খ ম্যালেরিয়া রোগ *Plasmodium* গণের এককোষী প্রোটোজোয়া দ্বারা হয়। এ পরজীবী শুধুমাত্র মানুষ ও অ্যানোফিলিস জাতীয় মশকীর দেহে জীবনচক্র সম্পন্ন করতে পারে। অ্যানোফিলিস মশকী যখন কোনো ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত মানুষকে দংশন করে তখন প্লাজমোডিয়াম মানুষের রক্ত থেকে মশকীর দেহে প্রবেশ করে এবং নিষেক সম্পন্ন করে। পরবর্তীতে উক্ত অ্যানোফিলিস মশকী কোনো সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করলে *Plasmodium*-এর স্পোরোজোয়েট মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। তাই কেবল অ্যানোফিলিস মশকীই ম্যালেরিয়া ছড়ায়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রোগটি হলো ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণুর নাম *Plasmodium vivax*। এ পরজীবীটি মানবদেহের যকৃতে হেপাটিক সাইজোগনি সম্পন্ন করে। মানবদেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুর স্পোরোজোয়েট প্রবেশের পর প্রথম এক সপ্তাহে প্রিএরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি পর্যায়ের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। এতে স্পোরোজোয়েট, ক্রিন্টোজোয়েট, সাইজন্ট ও ক্রিন্টোমেরোজোয়েট এ ধাপগুলো দেখা যায়। স্পোরোজোয়েটগুলো রক্তরস থেকে যকৃত কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং এখানেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যকৃত কোষ থেকে বাদ্য গ্রহণ করে স্পোরোজোয়েটগুলো গোলাকার ক্রিন্টোজোয়েটে পরিণত হয়। প্রতিটি ক্রিন্টোজোয়েট ক্রমাগত নিউক্লিয়াস বিভাজনের মাধ্যমে বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত সাইজন্ট দশায় উপনীত হয়। সাইজন্টের প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সাইটোপ্লাজম জমা হয়ে নতুন কোষের সৃষ্টি হয় যা ক্রিন্টোমেরোজোয়েট নামে পরিচিত। পরিণত ক্রিন্টোমেরোজোয়েটগুলো সাইজন্টের প্রাচীর বিদীর্ণ করে যকৃতের সাইনুসয়েডে আশ্রয় নেয়। এভাবে ম্যালেরিয়া পরজীবী যকৃতে প্রিএরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি সম্পন্ন করে পরে উৎপন্ন মেরোজোয়েটগুলো নতুন যকৃতকোষকে আক্রমণের মাধ্যমে এক্সোএরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনির সূচনা করে যা পরবর্তীতে সাইজন্ট দশায় পৌঁছায়। সাইজন্ট দশা থেকে পূর্বে বর্ণিত নিয়মেই বিভক্ত নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সাইটোপ্লাজম জমা হওয়ার মাধ্যমে নতুন কোষ সৃষ্টি হয় যাদেরকে মেটাক্রিন্টোমেরোজোয়েট বলে। এগুলো আক্রান্ত যকৃত কোষ বিদীর্ণ করে বের হয়ে আসে।

ঘ ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু *Plasmodium* এর জীবনচক্র সম্পন্ন করতে অবশ্যই মানুষের দেহ এবং মশকী প্রয়োজন। কারণ জীবন চক্রের যৌন দশাটি মশকীর দেহে এবং অযৌন দশাটি মানুষের দেহে সম্পন্ন হয়। এখানে মশকীর দেহে প্রথমে দু'প্রকার গ্যামিটোসাইট প্রবেশ করে সেখানে তারা মিলিত হয়ে জাইগোট উৎপন্ন করে। জাইগোটটি শেষে মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে স্পোরোজোয়েট উৎপন্ন করে। উৎপন্ন স্পোরোজোয়েট পুনরায় মশকীর দেহে আক্রমণ করে না বরং মানুষের দেহে চলে আসে। এরপর স্পোরোজোয়েট প্রথমে যকৃত কোষ ও পরে লোহিত রক্তকণিকা আক্রমণ করে এবং সেখানে অযৌন জনন ঘটায়। তবে মানুষের দেহে পরজীবী শুধুমাত্র অযৌন চক্রের মাধ্যমে বারবার সাইজোগনি সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু যৌন চক্রের জন্য অবশ্যই মশকী প্রয়োজন। সুতরাং আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, অ্যানোফিলিস মশকীই পরজীবীটির প্রাথমিক পোষক।

প্রশ্ন ▶ ৫৬



[মুরারিচাঁদ কলজ, সিঙ্গেট]

- ক. মাইকোরাইজাল ছত্রাক কী? ১
- খ. সিনোসাইটি মাইসেলিয়াম বলতে কী বুঝ? ২
- গ. চিত্রে প্রদর্শিত উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্র দিয়ে প্রজনন অংশ উন্মুক্ত হয়ে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে যে শস্য-রোগের সৃষ্টি করছে তার লক্ষণসমূহ উল্লেখ কর। ৩
- ঘ. কী কী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ সম্ভব, এ ব্যাপারে তোমার সুস্পষ্ট মতামত দাও। ৪

৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উদ্ভিদের সবু মূল বা মূলরোমের চারদিকে বা অভ্যন্তরে জালের মত বেষ্টনকারী নির্দিষ্ট ছত্রাকই মাইকোরাইজাল ছত্রাক।

২. ছত্রাকের ক্ষেত্রে অনেকগুলো হাইফি একত্রে অবস্থান করে ছত্রাক এর দেহ গঠন করলে তাকে মাইসেলিয়াম বলে। ছত্রাকের উক্ত মাইসেলিয়াম এক বা একাধিক নিউক্লিয়াসযুক্ত হতে পারে। বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত প্রমথপ্রাচীরবিহীন মাইসেলিয়ামকে সিনোসাইটিক মাইসেলিয়াম বলে। যেমন— *Mucor*, *Saprolegnia* ইত্যাদিতে ছত্রাকে ইহা বিদ্যমান।

৩. উদ্ভীপকের চিত্রে প্রদর্শিত উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্র দিয়ে প্রজনন অংশ উন্মুক্ত হয়ে ক্রমশ বিস্তার লাভ করে—

ধানের ব্রাইট রোগ সৃষ্টি করে। *Xanthomonas oryzae* নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগের সৃষ্টি হয়। নিচে এ রোগের লক্ষণসমূহ উল্লেখ করা হলো—

সাধারণত আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসের দিকে এ রোগের সূচনা হয়। পাতায় ডেঙ্গা অর্ধবৃত্তাকার লম্বা দাগের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাতার শীর্ষে শুরু হয়।

দাগ ক্রমশ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বড় হতে থাকে এবং ঢেউ খেলানো প্রাপ্ত বিশিষ্ট হয়।

দাগগুলো ক্রমশ হলুদ বা হলদে সাদা বর্ণের হয়।

সকালে দুধের মতো সাদা বা অর্ধবৃত্তাকার রস আক্রান্ত স্থান থেকে ধীরে প্রবাহিত হয়।

শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন স্যাপ্রোফাইটিক ছত্রাকের আক্রমণে ক্ষত স্থান ধূসর বর্ণের হয়।

vii. আক্রমণ বেশি হলে পাতা দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং গাছটি মারা যায়।

viii. লাগানোর ১-৩ সপ্তাহের মধ্যে চারাও প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত হতে পারে। আক্রমণ বেশি হলে চারা ঢলে পড়ে।

ix. ধানের ছড়া বন্ধ্যা হয়, তাই ফলন ৬০% পর্যন্ত কম হতে পারে।

x. ধানের শীষে কোনো ফলন হয় না।

৪. যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ সম্ভব, নিচে সে ব্যাপারে আমার সুস্পষ্ট মতামত তুলে ধরলাম—

প্রতিকার ও প্রতিরোধ :

সবচেয়ে কার্যকরী হলো রোগ প্রতিরোধক্ষম প্রকরণ চাষ করা। বীজই রোগ জীবাণুর প্রধান বাহন। ব্রিচিং পাউডার (১০০ mg/ml) এবং জিঙ্ক সালফেট (২%) দিয়ে বীজ শোধন করলে রোগাক্রমণ বহুলাংশে কমে যায়।

কপার যৌগ, অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ভালো সুফল আনে না, কিছুটা উপকার হয়।

জমিকে অবশ্যই আগাছামুক্ত রাখতে হবে। এছাড়া ধানের বড়, নিজ থেকে গজানো চারা সরাতে হবে।

বীজতলায় পানি কম রাখতে হবে, অতিবৃষ্টির সময় পানি সরানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। চারা থেকে চারার দূরত্ব, লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব, সার প্রয়োগ (বিশেষ করে ইউরিয়া) বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে।

বীজ বুনা বা চারা লাগানোর আগে জমিকে ভালোভাবে শুকাতে হবে, পরিত্যক্ত বড় ও আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

রোপণের সময় চারাগাছের পাতা ছাঁটাই করা নিষেধ।

নাইট্রোজেন সার বেশি ব্যবহার করা যাবে না।

গাছ আক্রান্ত হলে ক্ষেতে হেক্টর প্রতি ২ কেজি ব্রিচিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে।

ফিনাইল সালফিউরিক অ্যাসিটেড এম. ক্লোরামফেনিকল ১০-২০ লিটার পরিমাণে মিশিয়ে আক্রান্ত ক্ষেতে ছিটালে রোগ নিয়ন্ত্রণ হয়।

বীজ বপনের আগে ০.১% সিরিসান দ্রবণে ৮ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে বীজবাহিত সংক্রমণ রোধ হয়।

- ক. ATP এর পূর্ণরূপ লিখ। ১
খ. ইমাস্কুলেশন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্ভীপকে 'P' এর অভ্যন্তরে সংঘটিত 'Q' এর প্রজনন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ৩
'Q' দ্বারা সৃষ্ট রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায় ব্যাখ্যা কর। ৪

৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ATP এর পূর্ণরূপ Adenosine Triphosphate।

খ. কোন উদ্ভিদের পুংকেশরগুলোকে বন্ধ্যাকরণ বা অকার্যকর করাকে ইমাস্কুলেশন বলে। যে পুষ্পকে মাতৃপুষ্প হিসেবে ধরা হয় তা যদি উভলিঙ্গ হয় তাহলে ইমাস্কুলেশন করা হয় পরিপক্ব হবার আগেই পুষ্প থেকে পুংকেশর ছিড়ে ফেলা বা সরিয়ে ফেলাকে ইমাস্কুলেশন বলা হয়। ইমাস্কুলেশনের ফলে স্বপরাগায়ন ঘটতে পারে না।

গ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত 'P' দ্বারা RBC অর্থাৎ Red Blood Cell তথা লোহিত রক্ত কণিকাকে এবং 'Q' দ্বারা *Plasmodium* নামক ম্যালেরিয়ার জীবাণুকে নির্দেশ করা হয়েছে। মানবদেহের লোহিত রক্তকণিকায় এ জীবাণু এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি নামক প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রক্রিয়াটির বর্ণনা নিম্নরূপ—

প্রথমে মাইক্রো-মেটাক্রিন্টোমেরোজয়েটগুলো যকৃত কোষ থেকে লোহিত রক্ত কণিকায় প্রবেশ করে এবং খাদ্য গ্রহণ করে স্ফীত ও গোলাকার হয়। এই দশাকে ট্রফোজয়েট দশা বলে। এ অবস্থায় জীবাণুর দেহে ক্ষুদ্র একটি কোষ গহ্বর ও ছোট নিউক্লিয়াস দেখা যায়। এটি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী দশা। কোষ গহ্বরটি ধীরে ধীরে বড় হয় এবং নিউক্লিয়াসটি এক পাশে সরে যায়, ফলে জীবাণুটি একটি আংটি আকৃতি লাভ করে। এই অবস্থাকে সিগনয়েট রিং বলা হয়। এ দশায় জীবাণু ক্ষণপদবিশিষ্ট *Amoeba* এর আকৃতি প্রাপ্ত হয় তখন একে অ্যামিবিয়ড ট্রফোজয়েট বলে। এ সময় লোহিত রক্ত কণিকাটি আকারে স্ফীত হয় এবং সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা দেখা যায়। এগুলোকে সাফনার্স দানা বলে। অ্যামিবিয়ড ট্রফোজয়েট দশার কোষস্থ নিউক্লিয়াস বারবার বিভাজনের মাধ্যমে ১২-১৪টি অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট এই অবস্থাকে সাইজন্ট বলা হয়। এর সাইটোপ্লাজমে হিমোজয়েন নামক বর্জ্য পদার্থ জমা হয়। সাইজন্ট দশার প্রতিটি নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম ও প্লাজমামেমব্রেনসহ বিভক্ত হয়ে ১২-১৮ টি মেরোজয়েট এ পরিণত হয়। মেরোজয়েটগুলো গোলাপের পাপড়ির ন্যায় দুই স্তরে সজ্জিত হয়। একে রোজেট বলে। পরবর্তী অবস্থায় লোহিত রক্ত কণিকাগুলো ভেঙে যায় এবং মেরোজয়েটগুলো প্লাজমায় বের হয়ে আসে। মুক্ত মেরোজয়েট নতুন লোহিত কণিকাকে আক্রমণ করে এবং একইভাবে চক্রটি পুনরাবৃত্তি ঘটায়।

ঘ. উদ্ভীপকে 'Q' দ্বারা নির্দেশিত *Plasmodium* নামক জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট রোগটি হলো ম্যালেরিয়া। এ রোগটি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায় নিম্নরূপ—

প্রতিরোধের ক্ষেত্রে : স্ত্রী *Anopheles* মশকী এই রোগের জীবাণু বহন করে থাকে এবং এক রোগী থেকে অন্য সুস্থ দেহে সংক্রমণ ঘটিয়ে থাকে। এজন্য বলা যায়, মশকী নিধনই ম্যালেরিয়া জ্বর প্রতিরোধের একমাত্র উপায়। মশকী নিধনের জন্য মশকীর প্রজনন ক্ষেত্রগুলো ধ্বংস করা, প্রজনন ক্ষেত্রে নিয়মিত ঔষধ ছিটানো, মশার লার্ভা ধ্বংস করা হয়। জলাশয়ে মশকীর লার্ভা ভক্ষণকারী গাঙ্গী, চেলা, খলিশা মাছ চাষ করা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়া ঘরে মশারী ব্যবহার, মশকী নিধনকারী রাসায়নিক স্প্রে করা, মশকীরোধী ক্রিম ব্যবহার করা উচিত। এছাড়া বাড়ির আশেপাশে প্রচুর পরিমাণে তুলসি গাছ লাগালে মশকীর উপদ্রব কম হয়।

উপরোক্ত সতর্কতাসমূহ মেনে চললে তথা সচেতন থাকলে এ রোগ সহজেই প্রতিরোধ করা যায়।

প্রতিকারের ক্ষেত্রে :

ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক্লোরোকুইন, নিভাকুইন, ম্যাপাক্রিন, প্যালুড্রিন ইত্যাদি ম্যালেরিয়ার জীবাণু ধ্বংসের ভালো ঔষধ।

রোগীকে সর্বদা মশারীর ভিতরে রাখতে হবে।

রোগীকে যেন কোনোভাবেই মশা কামড়তে না পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। কেননা মশকীর মাধ্যমে রোগীর দেহ থেকে এই রোগীর পরজীবী অন্য সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রমিত হয়ে থাকে।

প্রঃ ৫৮ জামান সাহেব রাজামাটি বেড়াতে গিয়ে কয়েকদিন পরেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নির্দিষ্ট সময় পরপর কাঁপুনি সহ জ্বর আসায় ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার তার রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে দেখলেন রক্তের বিশেষ একটি কণিকার সংখ্যা খুবই কম। ডাক্তার তাকে ঔষধ দেয়ার পাশাপাশি বললেন, এক ধরনের এককোষী পরজীবী আক্রমণে এই রোগ দেখা দেয় এবং কিছু সতর্কতা অবলম্বন করলে ইহা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

(অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল)

- ক. মেরোজাইগোট কি? ১
- খ. ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বলতে কি বুঝ? ২
- গ. উদ্ভীপকের বিশেষ কণিকায় পরজীবীটির সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. উদ্ভীপকের শেষের উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

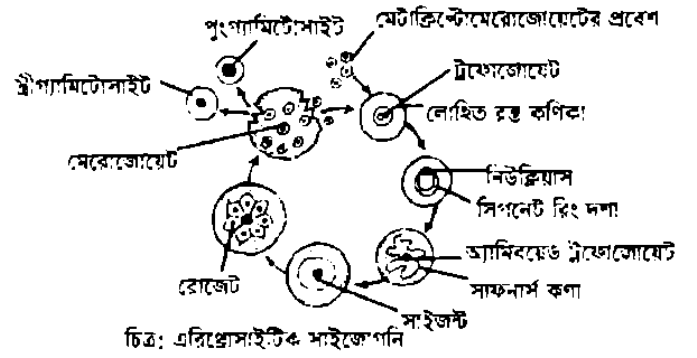
৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যৌন মিলনের সময় ব্যাকটেরিয়া দাতা কোষ হতে আংশিক ক্রোমোজোম গ্রহণের মাধ্যমে গ্রহীতা কোষ যে জাইগোট তৈরি করে তাই হলো মেরোজাইগোট।

খ জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে জিনের স্থানান্তর ঘটিয়ে যে সব উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয় তাদেরকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বলা হয়। এ প্রক্রিয়ায় রিকম্বিনেন্ট DNA কৌশল প্রয়োগ করে সৃষ্টি রিকম্বিনেন্ট DNA কে কোন বাহক বা মাইক্রোইনজেকশনের মাধ্যমে উদ্ভিদ কোষের প্রোটোপ্লাস্টে প্রবেশ করানো হয় এবং পরবর্তীতে ঐ কোষ থেকে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ তৈরি করা হয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী ভুট্টা তৈরি করা হয়েছে।

গ উদ্ভীপকে উল্লিখিত লক্ষণগুলো দেখে বোঝা যায় জামান ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছেন। Anopheles মশকীর মাধ্যমে ম্যালেরিয়া জীবাণু Plasmodium মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়। Anopheles মশকীর দংশনের মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার জীবাণু দ্বারা জামান প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন। জামানের যকৃত কোষ থেকে বের হওয়া জীবাণুর মেরোজয়েট দশা লোহিত রক্তকণিকাকে আক্রমণ করে ভেতরে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তা সিগনেট রিং, অ্যামিবিয়ড ট্রফোজয়েট দশা পার করে বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট সাইজন্ট দশায় পৌঁছায়। সাইজন্ট বহুবিভাজন প্রক্রিয়ায় মেরোজয়েট উৎপন্ন করে। এ সময় কোষে বিষাক্ত হিমোজয়েন উৎপন্ন হয়। লোহিত রক্তকণিকা ভেঙ্গে মেরোজয়েটগুলো হিমোজয়েন সহ প্লাজমায় বেরিয়ে আসে এবং বিমুক্তিয়া সৃষ্টি করে। একই সাথে মেরোজয়েটগুলোকে ধ্বংস করার জন্য স্বেতকণিকা অতিরিক্ত পাইরোজেন নামক বিষাক্ত পদার্থ ক্ষরণ করে। আর এর ফলেই জামানের

কম্পন দিয়ে জ্বর শুরু হয়। পরবর্তীতে মেরোজয়েটগুলো পুনরায় লোহিত কণিকাকে আক্রমণ করে তার জীবনচক্র সম্পন্ন করতে থাকে। এ চক্রকে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি বলে। অর্থাৎ ম্যালেরিয়া জীবাণুর এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনির মাধ্যমেই জামান উক্ত পরজীবী দ্বারা ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন।



চিত্র: এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি

ঘ জামানের রোগের লক্ষণ থেকে বুঝা যায় সে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত। Plasmodium-এর আক্রমণে এ রোগ হয়। সতর্কতা অবলম্বনে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ রোগ প্রতিরোধ করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

মশার প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস : মশকীর বন্ধ, পচা পানিতে ডিম পাড়ে এবং সেখানে ডিম ফুটে লার্ভা ও পিউপা দশার বিকাশ ঘটে। তাই মশা নিধনের জন্য মশার জননক্ষেত্রগুলো বিনাশ করাই উত্তম।


মশার লার্ভা ও পিউপা ধ্বংস : যেসব জলাশয়ে মশকীর ডিম পাড়ে সেখানে পানির ওপর কেরোসিন বা পেট্রোল জাতীয় তেল ছিটিয়ে দিলে পানির ওপর একটি পাতলা স্তর সৃষ্টি হয়। ফলে এ স্তর ভেদ করে মশকীর লার্ভাগুলোর পক্ষে বাতাস গ্রহণ সম্ভবপর না হওয়ায় তারা মারা পড়ে। বিএইচসি, ডায়েলড্রিন ইত্যাদি কীটনাশক ওষুধ তেলের সাথে মিশিয়ে পানিতে ছিটিয়ে দিলে মশকীর লার্ভা ও পিউপা মারা যায়। জলাশয়ে কই, খলসে, তেলাপিয়া জাতীয় লার্ভা খাদক মাছ চাষের মাধ্যমে মশকীর লার্ভা ও পিউপা ধ্বংস করা যায়।

পূর্ণাঙ্গ মশকী নিধন : দংশন উদ্যত মশকী, হাত বা মসকুইটো ব্যাকেট দিয়ে মেরে ফেলা। বিভিন্ন ফাঁদের সাহায্যে মশকী ধরা। বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান যেমন- সালফার ডাইঅক্সাইডের ধোয়া মশা তাড়াতে বা মেরে ফেলতে পারে। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ও বিকিরণ দিয়ে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে মশার বংশবিস্তার রোধ করা যায়।

মশকীর দংশনের হাত থেকে আত্মরক্ষা : শয়নকক্ষে মশারী ব্যবহার করা। দেহের অনাবৃত অংশে বিশেষ ক্রিম বা লোশন লাগানো। মশকী নিধন কয়েল জ্বালানো বা স্প্রে ব্যবহার করা। ঘরের দরজা জানালায় ঘন তারের নেট লাগানো। মশার উৎপাত বেশি এরূপ জায়গা থেকে শয়ন কক্ষ দূরে রাখা।

কাজেই উপর্যুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

চতুর্থ অধ্যায়: অণুজীব

১০৭. 'ভাইরাস' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
 (ক) উপকারি (খ) অপকারি
 (গ) বিষ (ঘ) সংক্রামক
১০৮. অ্যান্টিবায়োটিক কাদের দেহে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে অক্ষম? (জ্ঞান)
 (ক) ভাইরাস (খ) ব্যাকটেরিয়া
 (গ) ছত্রাক (ঘ) শৈবাল
১০৯. ভাইরাস এর মাথার বিস্তারী প্রোটিন নির্মিত আবরণকে কী বলে? (জ্ঞান) /স. বো.-১০/
 (ক) প্রাক্সিমামেনট্রেন (খ) কপার
 (গ) জিনোম (ঘ) ক্যাপসিড
১১০. কোথায় রিসূত্রক RNA দেখা যায়?
 (অনুধাবন) /সি. বো.-১০/
 (ক) ব্যাকটেরিওফাজ (খ) কলিকাজ
 (গ) রিওডাইরাস (ঘ) ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস
১১১. রিও ভাইরাসে কোনটি থাকে? (জ্ঞান)
 (ক) এক সূত্রক DNA (খ) দ্বি সূত্রক DNA
 (গ) এক সূত্রক RNA (ঘ) দ্বি-সূত্রক RNA
১১২. কোন ভাইরাসটি পাউরুটি আকৃতির? (প্রয়োগ)
 (ক) T₂ ফায় (খ) ভ্যাক্সিনিয়া
 (গ) HIV (ঘ) TMV
১১৩.

 চিত্রের গঠনটির নাম কী? (অনুধাবন) /সি. বো.-১০/
 (ক) T₂-ফায় (খ) ভ্যাক্সিনিয়া
 (গ) TMV (ঘ) পোলিও
১১৪. সক্রমণ ক্ষমতাহীন ভাইরাসকে কী বলে? (জ্ঞান)
 (ক) ভিরিয়ন (খ) ক্যাপসোমিয়ার
 (গ) পেনপেলোমিয়ার (ঘ) নিউক্লিওক্যাপসিড
১১৫. মানবদেহে বসন্ত রোগ সৃষ্টি করে কোন ভাইরাস? (জ্ঞান)
 (ক) ডেরিওলা (খ) রুবিওলা
 (গ) র্যাবিস (ঘ) H₁N₁
১১৬. টিউলিপ ফুলের পাপড়িতে বর্ণবিচ্যুতি সৃষ্টি করে কোন অণুজীব? (অনুধাবন)
 (ক) ব্যাকটেরিয়া (খ) ভাইরাস
 (গ) ছত্রাক (ঘ) শৈবাল
১১৭. কোন বিজ্ঞানী ব্যাকটেরিওফাযের নামকরণ করেন? (জ্ঞান)
 (ক) F.C. Bawden (খ) A. Mayer
 (গ) N.W. Pirie (ঘ) d'Herelle
১১৮. পোলের রিং স্পট রোগের জন্য দায়ী নিচের কোন ভাইরাসটি? (জ্ঞান)
 (ক) H₁N₁ (খ) T₂ ফায়
 (গ) HIV (ঘ) PRSV
১১৯. কোনটি সোয়াইন ফ্লু রোগের জন্য দায়ী? (অনুধাবন)
 /পরীক্ষার উদ্দেশ্যে: জানোয়ার পার্সি কলেক্স, ঢাকা/
 (ক) র্যাবিস (খ) ডেরিওলা
 (গ) রুবিওলা (ঘ) H₁N₁
১২০. নিচের কোনটি PRSV এর প্রাকৃতিক বাহক? (জ্ঞান)
 (ক) এফিড (খ) মাছি
 (গ) পিপড়া (ঘ) ভেলাপোকা

১২১. নিচের কোন হেপাটাইটিস সবচেয়ে মারাত্মক?
 (জ্ঞান)
 (ক) হেপাটাইটিস এ (খ) হেপাটাইটিস বি
 (গ) হেপাটাইটিস ডি (ঘ) হেপাটাইটিস ই
১২২. 'হাড় ভাঙা জ্বর' নিচের কোন জ্বরের আরেকটি নাম? (জ্ঞান)
 (ক) ডেঙ্গু জ্বর (খ) ম্যালেরিয়া জ্বর
 (গ) বাতজ্বর (ঘ) সাধারণ জ্বর
১২৩. ব্যাকটেরিওলজির জনক কে? (জ্ঞান) /সি. বো.-১০/
 (ক) এরেনবার্গ (খ) রবার্ট হুক
 (গ) লুই পাস্তুর (ঘ) লিউয়েন হুক
১২৪. ব্যাকটেরিয়া শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
 (ক) দণ্ড (খ) বিষ
 (গ) বৃষ্টির ফোঁটা (ঘ) ক্ষুদ্র প্রাণী
১২৫. ব্যাকটেরিয়া সর্বনিম্ন কত তাপমাত্রা পর্যন্ত বাঁচতে পারে? (জ্ঞান)
 (ক) -২০০° সে. (খ) -১৭০° সে.
 (গ) -১২০° সে. (ঘ) -১০০° সে.
১২৬. কোন ব্যাকটেরিয়া পাটের আঁশ ছড়াতে সাহায্য করে? (জ্ঞান) /সি. বো.-১০/
 (ক) Lactobacillus (খ) Clostridium
 (গ) Nitrosomonas (ঘ) Azotobacter
১২৭. Plasmodium vivax এর সুপ্তকাল কত দিন? (জ্ঞান)
 (ক) ৮-২৫ (খ) ১১-১৬
 (গ) ১২-২৫ (ঘ) ১৫-৩০
১২৮. ম্যালেরিয়া জ্বর সৃষ্টির পর্যায়ে পরজীবীর কোন দশাটি দেখা যায়? (অনুধাবন) /সি. বো.-১০/
 (ক) মেরোজয়েট (খ) স্পোরোজয়েট
 (গ) ক্রিন্টোমেরোজয়েট (ঘ) ক্রিন্টোজয়েট
১২৯. ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত মানুষের— (প্রয়োগ)
 i. রক্তশূন্যতা দেখা দেয়
 ii. গ্রীষ্ম বড় হয়ে যায়
 iii. বারবার পাতলা পায়খানা হয়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৩০. ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হয়— (উচ্চতর দক্ষতা) /সি. বো.-১০/
 i. তেল অপসারণে
 ii. অ্যাসিটোন তৈরিতে
 iii. ভিটামিন তৈরিতে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৩১. ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ হচ্ছে—
 (উচ্চতর দক্ষতা) /সি. বো.-১০/
 i. চোখের সাদা অংশ হলুদ হওয়া
 ii. চামড়ায় ছোট ছোট লাল ফুসকুড়ি
 iii. সমগ্র শরীরে ব্যথা অনুভব
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) ii ও iii
 (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৩২. চিত্র 'ক' এর বৈশিষ্ট্য হলো—

(উচ্চতর দক্ষতা) /সি. বে.-১৫/

- এটি একটি কমা কৃতির ব্যাকটেরিয়া
এটি কলেরা রোগের জীবাণু
iii. এটি একটি গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৩৩. ব্যাকটেরিয়া কোষের কোষপ্রাচীরের বাইরে একটি পিচ্ছিল ও অঠালো স্তর থাকে। এ স্তরটি— (উচ্চতর দক্ষতা)

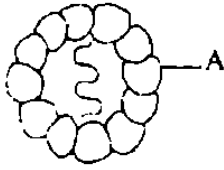
- বাইরের আঘাত থেকে কোষকে রক্ষা করে
ব্যাকটেরিয়াকে শুষ্কতা হতে রক্ষা করে
iii. পলিস্যাকারাইড বা পলিপেপটাইডের
পলিমার দ্বারা গঠিত
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৩৪. প্রতিকূল পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া অস্ত্র:রেণু মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। এ অস্ত্র:রেণু— (গ্রন্থাগার)
গোলাকার বা ডিম্বাকার ধরনের
পুরু প্রাচীর দিয়ে আবৃত
অঙ্কুরিত হয়ে দুটি অপত্য ব্যাকটেরিয়া
সৃষ্টি করে

- নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৩৫.



চিত্রে A চিহ্নিত অংশটি— (উচ্চতর দক্ষতা) /সি. বে.-১৫/
অ্যান্টিজেন-এর গুণাবলি বহন করে
প্রোটিন দ্বারা গঠিত

- iii. আবরণটির একককে ক্যাপসোমিয়ার বলে
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৩৬. ডাইরাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—

(উচ্চতর দক্ষতা) /সি. বে.-১৫/

- সকলেই অকোষীয়
বিপাকীয় এনজাইম নেই
iii. জিনেটিক রিকম্বিনেশন ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩৭ ও ১৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
জুয়েলের হঠাৎ করে মাথা ব্যথা, মাংসে পেশিতে ব্যথা, হাড়ে ব্যথা, ক্ষুধামন্দা এবং বমি বমি ভাব দেখা দেয়। তারপর দু'সপ্তাহের মধ্যে তার জন্তিস দেখা দেয়। ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার তাকে LFT পরীক্ষা করতে দেন এবং পরীক্ষায় রক্তরসে ট্রান্সঅ্যামাইলেজের পরিমাণ ২০০-২০০০ U/L এর মধ্যে পাওয়া যায়।

১৩৭. জুয়েল কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছে? (অনুধাবন)

- ক) ইনফ্লুয়েঞ্জা খ) হেপাটাইটিস

গ) এইডস

ঘ) ডেঙ্গু

১৩৮. জুয়েল যদি সময় মতো সূচিক্রিসে গ্রহণ না করে তবে পরবর্তীতে তার— (উচ্চতর দক্ষতা)

- লিভার ক্যান্সার হতে পারে
ব্লাড ক্যান্সার হতে পারে
iii. লিভার সেরোসিস হতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ১৩৯ ও ১৪০ নং প্রশ্নের দাও।

ড. আজমল চৌধুরী একটি স্লাইডে *E. coli* ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে দুটি ব্যাকটেরিয়া একধরনের নালি দ্বারা পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে আছে। তিনি বুঝতে পারেন যে, ব্যাকটেরিয়া দুটি একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় জনন সম্পন্ন করছে।

১৩৯. বিশেষ প্রক্রিয়াটির নাম কী? (অনুধাবন)

- ক) দ্বিবিভাজন খ) অনুলিপন
গ) মুকুলোদগম
ঘ) বংশগতীয় পুনঃসংযোগ

১৪০. উক্ত বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায়— (উচ্চতর দক্ষতা)

- নতুন সৃষ্ট অপত্য কোষে মিশ্র চরিত্রের বিকাশ ঘটে
দাতা কোষে মেরোজাইগোট গঠিত হয়
গ্রন্থীতা কোষ দ্বিবিভাজনের মাধ্যমে নতুন অপত্য কোষ সৃষ্টি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪১ - ১৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

দিশা তার বাবার সাথে তাদের গ্রাম ঘুরে দেখছিল। সে দেখল যে, একটি পুকুরে পাট ভুবিয়া রাখা হয়েছে। সে তার বাবাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তার বাবা তাকে জানায় যে এভাবে রাখলে পাটে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া জন্মায় যা পাট থেকে আঁশ ছাড়াতো সাহায্য করে।

১৪১. শিশার বাবা কোন ব্যাকটেরিয়ার কথা বলেছেন?

(অনুধাবন)

- ক) *Clostridium* খ) *Lactobacillus*
গ) *Pseudomonas* ঘ) *Azotobacter*

১৪২. উক্ত গণের ব্যাকটেরিয়ার একটি প্রজাতি মানব

দেহে নিচের কোন রোগটির সংক্রমণ ঘটায়? (গ্রন্থাগার)

- ক) ধনুষ্ঠংকার খ) কলেরা
গ) টাইফয়েড ঘ) যক্ষ্মা

১৪৩. ব্যাকটেরিয়াটি পাটের আঁশ ছাড়ানো ছাড়ানো — (গ্রন্থাগার)

শর্করা হতে অ্যালকোহল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়
বাতাসে নাইট্রোজেন গ্যাসকে সরাসরি সর্বাঙ্গ পরিণত করে
টাক্সা খাবারকে পচিয়ে খাওয়ার অনুপোযোগী করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii